এই বৎসরটি শ্রীঅরবিন্দের সার্ধ-শতবর্ষের জন্য উৎসর্গীকৃত

(১৫ অগাস্ট ১৮৭২—১৫ অগাস্ট ২০২২)

১৫.৮.১৮৭২ ১৫.৮.১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দের শতবর্ষে যে শ্রেষ্ঠতম সম্মান আমরা তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে পারি তা হ'ল প্রগতির জন্য এক তৃষ্ণাকে অর্জন করা এবং ভগবৎ প্রভাবের অভিমুখে আমাদের সকল সত্তাকে উন্মুক্ত করে তোলা, পৃথিবীর বুকে তিনি ছিলেন যার অগ্রদূত।

শ্রীমা

সূর্যের মত তোমার জ্বলন্ত মহিমা নেমে আসে পৃথিবীর উপর, তোমারি কিরণ বিশ্বকে আলোকিত করবে।

শ্রীমা

'রূপান্তর' প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সহ যে সমস্ত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, গ্রাহক, পাঠক ও গ্রন্থ পরিবেশক যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করছেন — তাদের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

❑ গ্রাহক মূল্য ❑❑ ১৫০ টাকা (এক বছরের জন্য)

❑ পত্রিকা প্রকাশের দিন ❑❑ ২১ ফেব্রুয়ারী, ২৪ এপ্রিল,
১৫ অগাস্ট ও ২৪ নভেম্বর

❑ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

❑ যোগাযোগ ❑ মোবাইল ❑❑ ৯৪৩২৫২৫৭৯২ ❑❑ ৯৮৩১৩২২৪৩০

❑ ই-মেল ❑❑ roopantar@hotmail.com

❑ © শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট,
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

❑ সম্পাদনা ও প্রকাশনা ❑❑ রত্নাকর সেনগুপ্ত

❑ কো-অর্ডিনেটর ❑❑ জয়দীপ চক্রবর্তী

❑ অক্ষর বিন্যাস ❑❑ শিলালিপি,
বাসব চট্টোপাধ্যায়, ২০এ, বলাই সিংহ লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

❑ মুদ্রণ ❑❑ প্রিন্ট ও প্রসেস,১৫/৫/১, কে. বি. সরণী,
কলকাতা - ৭০০ ০৮০

❑ ৫০ টাকা

রূপান্তর : প্রযত্নে, সত্যপ্রিয়া গণেশ, ১/১এ, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেণ্ড লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০৩৯

মায়ের প্রার্থনা

এপ্রিল ১, ১৯১৭

মৌন সমাহিত অন্তরাত্মা আমার, তাকে তুমি দেখালে যাদুকরী দৃশ্যাবলীর সব ঐশ্বর্য—তরুলতা সেজেছে উৎসবসজ্জায়, জনশূন্য পথ চলেছে যেন আকাশ ডিঙ্গিয়ে।

কিন্তু আমার ভাবী নিয়তি সম্বন্ধে তুমি তো কিছু বললে না, সেটি তবে আমার কাছ থেকে এতখানি ঢেকে রাখতে হবে?...

আরো দেখছি, চারদিকেই দেখছি চেরীগাছ সব, এর ফুলের মধ্যে তুমি একটা অপরূপ গুণ ভরে দিয়েছ, তারা যেন বলছে একমাত্র তুমিই আছ, তারা বয়ে নিয়ে আসছে ভগবানের স্মিত হাস্য।

দেহ আমার শান্ত হয়ে রয়েছে, অন্তরাত্মা আমার বিকশিত হয়ে উঠছে—কি যাদু তুমি এই পুষ্পিত তরুরাজির মধ্যে নিহিত করেছ?

হে জাপান! এ হল তোমার শুভেচ্ছার রাজপোশাক, তোমার শুদ্ধতম অর্ঘ্য, তোমার নিষ্ঠার অভিজ্ঞান। এইভাবেই তুমি বলছ যেন স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া তোমাতে প্রতিফলিত।

আবার চেয়ে দেখ অপরূপ শোভার দেশ—সমুচ্চ পর্বতমালা পাইন গাছে ঢাকা আর কোলে কোলে চাষ-আবাদের জমি। আর ঐ যে চীনা মানুষটি হাতে করে নিয়ে আসছে গোলাপী রঙের কটি ছোট্ট গোলাপ, এও কি আসন্ন ভবিষ্যতের আশার বার্তাবহ নয়?

উৎস :*Prières et Méditations*

গ্রন্থের অনুবাদ : *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ: ২০১,

অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

❑ সূচী ❑

		পৃষ্ঠা
❑ সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে: মা ভাগবতী ও মানবী	❑❑ নলিনীকান্ত গুপ্ত	১
❑ নীরবতাই সব	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৩
❑ ভালোবাসা	❑❑ শ্রীমা	৪
❑ ৪ এপ্রিল ১৯১০	❑❑ শ্রীমা	৫
❑ নদী যেমন সমুদ্রের দিকে যায়...	❑❑ শ্রীমা	৭
❑ ভগবানকে সবকিছু করতে দাও	❑❑ শ্রীমা	৯
❑ সৌন্দর্য	❑❑ শ্রীমা	১২
❑ সর্বজনীন বিষয়সমূহ	❑❑ শ্রীমা	১৭
❑ পিছনে সরে আসা	❑❑ শ্রীমা	১৯
❑ মানুষ প্রায়ই কর্মের সজাগ সাক্ষী হয় না।...	❑❑ শ্রীমা	২৩
❑ সবার আগে তোমায় জানতে হবে তোমার চেতনাটি কি বস্তু	❑❑ শ্রীমা	২৫
❑ বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৭
❑ যোগপথের বাধাবিঘ্ন	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	২৮
❑ প্রাণের রূপান্তর	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৩০
❑ আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৩৩
❑ এই বিশ্বের প্রহেলিকা	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৩৫

২৪ এপ্রিল ১৯২০

আমার পণ্ডিচেরী প্রত্যাবর্তনের বার্ষিকী হ'ল বিরুদ্ধ শক্তিদের উপর নিশ্চিত বিজয়লাভের মূর্ত প্রতীক।

২৪ এপ্রিল ১৯৩৭ শ্রীমা

উৎস: Cent. Edi. Vol. No. 13, p.63, অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে:

মা ভাগবতী ও মানবী

নলিনীকান্ত গুপ্ত

মানুষী দুর্বলতায় আচ্ছন্ন আমরা ভগবতী জননীকে দেখি শুধু জননী রূপে, ভুলে যাই যে তিনি আবার ভগবতী। তাঁর এই অপরূপ পরিচয়ের প্রথম অংশই সহজে আমরা পূর্ণ হিসাবে গ্রহণ করি, অপর অংশটিও যে সমান তাৎপর্যপূর্ণ তা লক্ষ্য হয় না। সন্তানের উপর মানুষী মায়ের যেমন স্নেহ-মমতা, তাঁর কাছ থেকেও আমরা তেমনই স্নেহ-মমতা প্রত্যাশা করি। আমরা তাঁকে দেই মানুষী ভালবাসা, মানুষের অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভালবাসা—তার মধ্যে লোভ আর ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনা, আধিপত্যের বাসনা সর্বত্র, মা হলেন যেন আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার নিমিত্ত মাত্র।

মা অবশ্যই মা, তবে ভগবতী মা। তিনি চান তাঁর কাছে আমরা যাই মানুষীভাবে নয়, দিব্যভাবে। এই দিব্যভাবেই আমরা উঠে যাই আমদের সত্তার উত্তুঙ্গ শিখরে, পৌঁছি গভীরতম গভীরে, তাঁকে পাই পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষে, তাঁর করুণার অমৃতধারায় অবগাহন করে উঠি। মানুষী ভাব মানবীয় বোধ অনুভবের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার মধ্যে কেবল আমাদের বেঁধে রাখে। অত্যধিক আদরে নষ্ট সন্তানের ধারা হল এই মানুষী ধারা। এক্ষেত্রে অন্তরের নিম্নতম তলায় এক বিন্দু সত্যকার ভালবাসা থাকলেও তা রয়েছে পুঞ্জীভূত অজ্ঞান আর রাশীকৃত পঙ্কিল ক্লেদের মধ্যে ডুবে। এই ধূলি-জঞ্জাল আমাদের মলিন করে, আমাদের প্রেমাস্পদকেও স্পর্শ করে।

তবুও, ভগবতী হয়েই তিনি জননী। ভগবতী বলে সুদূরের নিস্পৃহ কেউ নন, বিশ্বাতীত ব্রহ্মের মত নির্মম উদাসীন নন। বস্তুত, ভগবতী জননীর মাতৃস্নেহ মানুষী মাতার স্নেহকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। এই মানুষী মা সেই আদি জগতে দিব্য জননীর একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র, কখনো কখনো একটা বিকৃতিই।

বিশ্বাতীত হয়েও ভগবতী জননী নেমে এসেছেন এই আমাদের মানুষী আধারে, আমাদেরই মত হয়েছেন, আত্মস্বরূপ হয়ে আমাদেরই অন্তরে রয়েছেন, সঙ্গে থেকে হয়েছেন সাথী দিশারিণী। আমরা যখন অনুগত হতে পেরেছি তখন তিনি হাত ধরে নিয়ে চলেছেন আমাদের, দেখিয়েছেন কি করে আমাদের ক্ষুদ্র মানুষত্বকে পার হয়ে যেতে হয়, আর দেখিয়েছেন আমাদের ভালবাসা যদি যথেষ্টভাবে জাগে তাঁর ভালবাসার স্পর্শে তবে—সেই তাঁর প্রেমের দৈবশক্তিতে কি করে আমরা আমাদের আপন দিব্য সত্তা ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি।

আমরা মায়ের প্রকৃত সন্তান হতে পারি যদি স্মরণে রাখি তাঁর দ্বিবিধ সত্য, তাঁর প্রেমের দুই বাহু— যা দিয়ে তিনি আমাদের রেখেছেন ঘিরে, করুণাভরে।

উৎস: ***রচনাবলী*, নবম খণ্ড, পৃ: ৫১১-১২**

নীরবতাই সব

শ্রীঅরবিন্দ

(১)
নীরবতাই সব, জ্ঞানীরা বলেন—
নীরবতাই দেখে যায় যুগ-যুগান্তরের কর্মধারা,
নীরবতার গ্রন্থে বিশ্বগ্রন্থকার তাঁর বিশ্বের পৃষ্ঠায় লিখে চলেছেনঙ্খ
নীরবতাই সব, জ্ঞানীরা বলেন।

(২)
কথা তবে কি, হে কথক?
চিন্তা তবে কি, হে চিন্তক?
চিন্তা হল অন্তরাত্মার মদিরা, কথা হল ভৃঙ্গার;
জীবন হল ভোজনশালা, জ্ঞানীর অন্তরাত্মা হল ভোক্তা।

(৩)
মদিরাই-বা কি, হে মর্ত্যজীব?
মদিরামত্ত আমি, জ্ঞানের দুয়ারে আমি বসে,
আশায় রয়েছি চিন্তার ওপার হতে, অমর্ত্য বাক্যের ওপার হতে আসবে
জ্যোতি।
কিন্তু দীর্ঘকাল বৃথাই রয়েছি জ্ঞানের দুয়ারপাশে।

(৪)
কি করে চিনবে তুমি জ্ঞান যখন আসবে, হে জিজ্ঞাসু?
কি করে চিনবে তুমি আলো যখন ফুটে উঠবে, হে সাক্ষী?
আমি শুনব আমার অন্তরে ভগবানের কণ্ঠ
জ্ঞানে বিনয়ে আমি ভরে উঠব;
আমি হয়ে উঠব তরু যেন আলো আহরণ করব
খাদ্যের মত, পান করব তার মধুময় অমৃতরস।

উৎস: ***Collected Poems*, P.107, অনুবাদ : নলিনীকান্ত গুপ্ত**

ভালোবাসা

শ্রীমা

।।১।।

ভালোবাসা হচ্ছে ভগবানের দিব্যশক্তি।

।।২।।

ভালোবাসার উৎস হচ্ছে ঊর্ধ্বশিখার মতো,
এক শুচিশুভ্র শিখা
যা সব প্রতিরোধ উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

।।৩।।

ভালোবাসার সারকথা হচ্ছে
একাত্মতার আনন্দ...
তার চরম বিকাশ মিলনের আনন্দরসে।

।।৪।।

ভালোবাসার উৎসে গেলে
দেখতে পাই ভালোবাসা এক, অভিন্ন...
যেমনটি চেতনা, এক অভিন্ন।
কিন্তু তার প্রকাশের দিক থেকে
সে প্রতিটি মানুষের স্বভাব অনুসারে
রঞ্জিত ও স্বতন্ত্র হয়ে যায়...

।।৫।।

বাস্তবিকই
সমস্ত জীবনটাই ভালোবাসা
যদি আমরা জানি
কেমন করে বাঁচতে হয়...

।।৬।।

নানারূপ আর শব্দের মধ্য দিয়ে
ভালোবেসেই
জীবনযাপন করি।

।।৭।।

সাধারণভাবে রূপই হচ্ছে
ভালোবাসার সাধনার পরিণতি

যা জড়ের বুকে নিয়ে আসে চৈতন্যকে...

।।৮।।

জড়ের বুকে
ভালোবাসার প্রথম রূপই
তাকে আত্মসাৎ করার প্রয়োজন...

।।৯।।

ভালোবাসার প্রথম প্রকাশই হচ্ছে
সেবা করা...

।।১০।।

ভালোবাসার অর্থ
অধিকার করা নয়
আপনাকে দান করা...

।।১১।।

আত্মদান বিনা
ভালোবাসাই হয় না...

।।১২।।

ভালোবাসা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ
আর তার কোন প্রয়োজন নেই
পারস্পরিক আদান প্রদানের...

।।১৩।।

ভালোবাসা নিজেই নিজের
পরিসমাপ্তি নয়
কিন্তু তা হচ্ছে এক পরম উপায়...

।।১৪।।

ভালোবাসা
এমনই এক সুপবিত্র জিনিস যে
তার সঙ্গে কোনরকম খেলা চলেনা...

।।১৫।।

ভালোবাসাতো
একমাত্র মানুষেরই মাঝে প্রকাশ পায়না—
সে রয়েছে সর্বত্র...

।।১৬।।

ভালোবাসাতো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়
ভালোবাসা হচ্ছে বিশ্বজনীন দিব্য অনুভূতি
যা তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে...

অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

❀

৪ এপ্রিল ১৯১০

(নির্বাচিত সংকলন)

শ্রীমা

(৪ এপ্রিল ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ উপলক্ষে প্রদত্ত বাণী)

।। ১৯৫০ ।।

আন্তরিক হও, সর্বদা আন্তরিক থাক, আরও আরও অনেক বেশী আন্তরিক হয়ে ওঠ।

সবার কাছ থেকে যে আন্তরিকতাকে দাবি করা হয় তা হল, তার চিন্তাবলী, তার অনুভূতি, তার বোধ এবং তার কর্মের মধ্যে দিয়ে সে অন্য কোন কিছুকেই প্রকাশ করবে না, প্রকাশ করবে কেবল তার সত্তার কেন্দ্রীয় সত্যকে।

।। ১৯৫১ ।।

পৃথিবীর উপর এক নতুন আলোর আবির্ভাব ঘটবে। নতুন এক জগতের জন্ম হবে: যা কিছুর জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সে সব কিছু পূর্ণ হয়ে উঠবে।

।। ১৯৬২ ।।

পৃথিবীর বুকে দেহগতভাবে বস্তুগতভাবে একজন তার কৃতজ্ঞতাবোধের মাঝেই শুদ্ধতম পরমানন্দের উৎসকে আবিষ্কার করে থাকে।

উৎস:*Words of the Mother,* Cent. Edi. Vol. No.15

নদী যেমন সমুদ্রের দিকে যায়, আমাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি ভগবানের দিকে প্রবাহিত হবে। —শ্রীমা

সকল অপূর্ণতার মধ্যেও রয়েছে ভগবানের পরম মনোনিবেশের অপরিবর্তনীয় শান্তি ও ভগবানের চিরন্তন অসীমের প্রশান্ত রূপ। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের আলোকে আমরা দেখব, ভগবানের জ্ঞানে আমরা জানব, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে আমরা উপলব্ধি করব। ২ অক্টোবর ১৯৫৪

*

ভগবানকে ব্যতীত সবই মিথ্যা ও মরীচিকা, সবই শোকপূর্ণ অন্ধকার। ভগবানে রয়েছে জীবন, আলোক ও আনন্দ। ভগবানে রয়েছে পরম শান্তি।

২ অক্টোবর ১৯৫৪

*

আমাদের সমস্ত শক্তি রয়েছে ভগবানে। তাঁর সহায়ে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারি। ৪ অক্টোবর ১৯৫৪

*

রাতের স্তব্ধতায় ভগবানের কণ্ঠস্বর সুরেলা স্তুতিরূপে শোনা যায়।

৭ অক্টোবর ১৯৫৪

*

ভগবানের বিজয় এত সম্পূর্ণ যে তাঁর বিরুদ্ধের প্রতিটি বাধা, প্রতিটি প্রতিকূল ইচ্ছা, প্রতিটি বিদ্বেষ আরও বৃহত্তর এবং আরও সম্পূর্ণ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করে। ৯ অক্টোবর ১৯৫৪

*

তাঁর আলোকের সম্পূর্ণতার জন্য আমরা ভগবানকে আবাহন করি যাতে আমাদের মধ্যে তাঁকে প্রকাশ করার ক্ষমতা জাগরিত হয়। ১০ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের বাণী সান্ত্বনা দেয়, আশীর্বাদ করে, প্রশমিত করে ও আলোক প্রদান করে এবং যে আচ্ছাদন আমাদের কাছ থেকে অনন্ত জ্ঞানকে আবরিত করেছে তার একটি পর্দা ভগবানের মহানুভব হস্তকে সরিয়ে দেয়। ১৮ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের প্রতি মনোনিবেশের ঐশ্বর্য: কত শান্ত, উদার ও পবিত্র।

১৯ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন জীবন যাপন করতে হবে যে জীবন একমাত্র ভগবানের দ্বারা প্রস্তুত, যার পরমপ্রভু হতে হবে একমাত্র ভগবানকে—আর তাহ'লে সমস্ত কষ্ট প্রশান্তিতে পরিণত হবে, সমস্ত মনস্তাপ শান্তিতে। ২০ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানকে আমাদের মধ্যে এত জাগ্রতভাবে অনুভব করি যে যা কিছু হবে তার জন্য প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করি, একথা আমরা জানি যে তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন আর তাই আমাদের সমস্ত পথে তিনি আছেন। ২৪ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের মহিমা সকল পরাজয়কে অসীমের বিজয়ে রূপান্তরিত করে, তাঁর বিচ্ছুরিত উজ্জ্বলতায় সকল ছায়া অপসারিত হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের উপস্থিতি আমাদের শক্তিতে আনে শান্তি, কার্যে আনে প্রশান্তি আর সকল পরিস্থিতিতে আনে অনাবিল সুখ। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবান অবিমিশ্র সুখ, আনন্দপূর্ণ শুভ, কিন্তু এই শুভ তখনই সর্বসুন্দর হয় যখন তা হয় পূর্ণাঙ্গ। ২২ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবান সেই সদা নির্ভরযোগ্য বন্ধু সেই শক্তি, সহায় ও পথপ্রদর্শক যিনি কখনও সরে দাঁড়ান না। ভগবান সেই আলোক যা অন্ধকার দূর করে, সেই বিজেতা যে জয় সুনিশ্চিত করে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

একমাত্র ভগবানই সেই সহায় যা কখনও ব্যর্থ হয় না।

*

একমাত্র ভগবান সর্বদাই সাড়া দেন।
একমাত্র ভগবানের ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না।
একমাত্র ভগবানকেই ভালবাস এবং ভগবান সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবেন।

৬ অগাস্ট ১৯৬৩

*

কেবলমাত্র পরমপ্রভুর মতামতের গুরুত্ব আছে।

কেবলমাত্র পরমপ্রভু আমাদের সমস্ত ভালবাসা লাভের যোগ্য এবং তিনি তা শতগুণে প্রত্যর্পণ করেন।

*

তোমার অন্তরাত্মা যেন কেবল ভগবানে আস্থা রাখে।

*

একমাত্র ভগবানের চিন্তা কর এবং ভগবান তোমার সঙ্গে থাকবেন।

*

একটিই কাজ, একটিই লক্ষ্য, একটিই আনন্দ—ভগবান।

*

নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকার অর্থ অবক্ষয় ও মৃত্যু। একমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ কর, তাহলে আসবে জীবন, বৃদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি।

*

ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবন বেদনাদায়ক মায়া, ভগবানকে সাথে নিলে সবই আনন্দময়।

*

আদর্শ মনোভাব হ'ল একমাত্র ভগবানের হওয়া, একমাত্র ভগবানের জন্য কাজ করা এবং সর্বোপরি একমাত্র ভগবানের কাছ থেকে শক্তি, শান্তি ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। ভগবান অসীম কৃপাময় এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্র লক্ষ্যে পৌছানর জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই প্রদান করেন।

*

দিব্য উপস্থিতিতে রয়েছে জীবনের মূল্য। এই দিব্য উপস্থিতি সকল শান্তি, সকল আনন্দ ও সকল নিরাপত্তা নিয়ে আসে। তোমার মধ্যে এই উপস্থিতি নিয়ে এসো এবং তোমার সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যাবে।

*

দিবারাত্র সবসময় রয়েছে দিব্য উপস্থিতি।
এর জন্য নীরবে অন্তর্মুখী হওয়াই যথেষ্ট এবং তাহলেই তা খুঁজে পাবে।

*

সর্বদা ভগবানকে স্মরণ কর এবং যা কিছু তুমি কর তা হবে দিব্য উপস্থিতির অভিপ্রকাশ।

*

কাজের মধ্যে এবং নীরবতায় দেওয়া ও নেওয়ায়, সর্বদা তোমাকে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ।

*

নদী যেমন সমুদ্রের দিকে যায়, আমাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি ভগবানের দিকে প্রবাহিত হবে।

*

সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি, সকল কাজ, সকল আশা যেন ভগবানের প্রতি যায় এবং তার মধ্যে কেন্দ্রিত হয়। তিনি আমাদের একমাত্র সহায় এবং আমাদের একমাত্র নিরাপত্তা।

*

হাঁ, বাছা, একথা অতি সত্য যে ভগবান একমাত্র রক্ষাকর্তা—তাঁর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা। (সমাপ্ত)

উৎস: *Words of the Mother,* Cent. Edi. Vol. No. 14, PP. 11-16,

অনুবাদ: মনোজ ভট্টাচার্য

ভগবানকে সবকিছু করতে দাও

শ্রীমা

এখন, আমি যখন এইভাবে দেখতে আরম্ভ করি (*শ্রীমা তাঁর দুই চোখ বন্ধ করলেন*), দুটো জিনিস একইসঙ্গে দেখতে পাই: এই হাসি, এই আনন্দ, এই উল্লাস সেখানে আছে, আর কি শান্তি! *এত পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, সামগ্রিক শান্তি—সেখানে কোন সংঘর্ষ নেই, কোন বিরোধিতা নেই। কোন বিরোধিতা আর নেই। নিটোল পরিপূর্ণ একটি উজ্জ্বল সুসঙ্গতি—আর, দেখতে পাই আমরা যাকে বলি ভুল, দুঃখ, দুর্দশা, সেসবও। এই দৃষ্টি কিছুই পরিবর্জন করে না। এটা আর একভাবে দেখা।

(দীর্ঘ নীরবতা)

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তুমি যদি এর থেকে** আন্তরিকভাবে নিষ্কৃতি পেতে চাও, তবে তা যাহোক খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়; তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি শুধু ভগবানকে সবকিছু করতে দেবে। আর তিনি সব করেন। তিনি সবকিছু করেন। এটা এমন একটা চমৎকার ব্যাপার, চমৎকার ব্যাপার!

---

*শ্রীমা আলাপের পূর্বভাগে প্রাচীনকালে মানুষের কোন এক অবস্থায় স্বর্গীয় জীবনের কথা বলছিলেন: সম্ভবতঃ এটা সেই পৃথিবীর উপর স্বর্গের কাহিনী। সেই স্বর্গে তাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ছিল এবং তারা অস্তিত্বের আনন্দ ভোগ করতে পারত। তাদের চেতনা ছিল পশুদের সমপর্যায়ের।—অনুবাদক

**ভুল করার অবস্থা থেকে।

তিনি যেকোন কিছু গ্রহণ করেন, এমনকি আমরা যাকে খুব সাধারণ বুদ্ধির লোক বলি তাকেও এবং তিনি শুধু শিখিয়ে দেবেন কি ক'রে এই বুদ্ধিকে একপাশে সরিয়ে রেখে চুপ করাতে হয়: ''এই যে, চুপ ক'রে থাক, একটুও নড়বে না, আমাকে জ্বালাতন করবে না, তোমাকে দরকার নেই।'' তখন একটা দরজা খুলে যায়—তোমার এমনও মনে হয় না যে তোমাকে দরজাটা খুলতে হবে; সেটা সম্পূর্ণ খোলা, তোমাকে দরজার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব অন্য একজন করছেন, তুমি নিজে করছ না। তখন নিজে নিজে করাটাই অসম্ভব হয়ে যায়।

এসব...ও, বুঝতে পারার জন্য মনের এই যে অমানুষিক পরিশ্রম, এই যে প্রবল প্রয়াস, তা মাথা ধরিয়ে দেয়!...এসব একেবারে নিরর্থক, একেবারেই নিরর্থক, কোন কাজে লাগে না, শুধু গণ্ডগোল আরও বাড়িয়ে দেয়।

ধর, তোমার সামনে একটা তথাকথিত সমস্যা এসেছে: তোমার কি বলা উচিত, তোমার কি করা উচিত, কেমন ভাবে কাজ শুরু করা উচিত? কিছু করার নেই, কিচ্ছু না, তোমাকে শুধু ভগবানের কাছে বলতে হবে, ''দেখ, জিনিসটা এইরকম।''

—ব্যস্, ওই পর্যন্ত। তারপর তুমি খুব শান্ত থাক। তারপরে বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেটার সম্বন্ধে কিছু না ভেবে বা কোনরকম চিন্তা না ক'রে কোন হিসেব না ক'রে কিছু নয়, কিছু নয়, কোনরকম সামান্যতম আয়াস না ক'রে—যা করার কথা তুমি কর। অন্য কথায় বলতে গেলে, ভগবান সেটা করছেন, তুমি আর নও। তিনি করছেন। তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থাসব সাজিয়ে নেন, লোকজন নির্বাচন করেন, তিনি তোমার মুখ দিয়ে বা তোমার কলম দিয়ে কথা ব্যক্ত করেন—তিনি সব করেন, সবকিছু, সবকিছু, সবকিছু;তোমাকে কিছুই আর করতে হবে না, শুধু নিজেকে আনন্দের মধ্যে ঢেলে দাও।

দিনে দিনে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে যে লোকে সত্যি সত্যি এটা চায় না।

কিন্তু জমি পরিষ্কার করা শক্ত ব্যাপার, আগের থেকে জমি পরিষ্কারের কাজটা।

সেটাও তোমার করার দরকার নেই। তোমার হয়ে তিনিই করেন।

কিন্তু তারা সর্বদাই ঢুকে পড়ে: পুরনো চেতনা, পুরনো চিন্তা...

হ্যাঁ, তারা আবার আসার চেষ্টা করে অভ্যাসের বশে। তোমাকে শুধু বলতে হবে, ''ভগবান, তুমি দেখ, তুমি দেখ, তুমি দেখ—জিনিসটা এইরকম''—ব্যস্। ''ভগবান, তুমি দেখ, তুমি এটা দেখ, তুমি ওটা দেখ, তুমি দেখ মূর্খটাকে''—আর সঙ্গে সঙ্গে সবশেষ, সেটা নিজে নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়, বাছা, সামান্যতম প্রয়াস ছাড়াই। শুধু আন্তরিক হতে হবে, অর্থাৎ অন্য কথায়, প্রকৃতই চাইতে হবে সবকিছু ঠিক হওয়ার জন্য। তুমি তখন পূর্ণ সচেতন যে তুমি কিছু করতে পার না, তোমার কোন ক্ষমতা

নেই।...কিন্তু সর্বদা কিছু থাকে যা নিজে নিজে করতে চায়; সেইটাই সমস্যা, নতুবা...

না, তুমি হয়তো একটা চমৎকার শুভেচ্ছা নিয়ে থাক আর তখন তা তুমি নিজে করতে চাও। সে জিনিসটাই সবকিছুকে জটিল ক'রে তোলে। কিংবা হয়তো তোমার বিশ্বাস নেই, তুমি মনে কর যে ভগবান এটা করতে পারবেন না, তোমাকেই তা করতে হবে, কেননা তিনি জানেন না! (শ্রীমা সশব্দে হাসেন) এই, এইরকম মূর্খতা খুব ব্যাপক। ''কি ক'রে তিনি জিনিসগুলো দেখবেন? আমরা মিথ্যার জগতে বাস করি, কেমন ক'রে তিনি মিথ্যা দেখবেন আর দেখতে পাবেন...।'' কিন্তু তিনি জিনিসগুলো যেমন সেইরকমই দেখেন! ঠিক সেইরকম!

আমি বুদ্ধিহীন লোকেদের কথা বলছি না, আমি বুদ্ধিমানদের কথা বলছি এবং তারা চেষ্টা করে—ওইরকম একটা দৃঢ়বিশ্বাসের মতো আছে, এমনকি সেইসব লোকেদের মধ্যেও যারা জানে যে আমরা অজ্ঞতা ও মিথ্যার জগতে বাস করি এবং একজন ভগবান আছেন যিনি সর্বসত্যময়। তারা বলে, ''তিনি সর্বসত্যময়, ঠিক সেই কারণেই তিনি বুঝতে পারেন না। (শ্রীমা সশব্দে হাসেন) আমাদের মিথ্যাচার তিনি বুঝতে পারেন না, আমাকেই ব্যাপারটা দেখতে হবে।'' এটা খুব গভীর, খুব ব্যাপক।

ওঃ! আমরা শুধু শুধুই জটিলতা সৃষ্টি করি।

উৎস: Cent. Edi. Vol.No.10, PP. 152-54, অনুবাদ: পীযূষ গুপ্ত

''যা-কিছু সত্য শিব ও সুন্দর, যা-কিছু সূক্ষ্ম শুচি ও মহৎ তারই ডাকে সাড়া দেওয়া, হৃদয়ের সচেতন আকুতি দিয়ে তাকে বরণ করা, ভাবনায় ও অনুভূতিতে, আচারে ও চরিত্রে তাকে রূপায়িত করবার জন্য প্রাণ-মনকে উন্মুখ ও উদ্যত রাখা, —অন্তর্গূঢ় চৈত্যপুরুষের পাঠানো প্রভাবের এই হল যোগিজনপরিচিত সুস্পষ্ট নিশানা।''

শ্রীঅরবিন্দ

উৎস: *পূর্ণযোগের সাধন-পদ্ধতি* (দ্বিতীয় খণ্ড),
যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়, পৃ: ১৬৫-৬৬

সৌন্দর্য [১]

শ্রীমা

সুন্দর বস্তু আনন্দদান করে শিল্পীসুলভ রুচিবোধকে। আর এটি নিজেই সুন্দর।

*

শিল্পীসুলভ সংবেদনশীলতা: অসুন্দরতার বিরুদ্ধে লড়াই করার এক শক্তিশালী সহায়।

*

শিল্পীসুলভ কার্যাদি: সকল কর্মই সুন্দরের সেবায় রত।

*

মা,

যে-সমস্ত কর্ম শিল্পিক নয় সেসবের উপরে কাজ করার জন্য আমরা কি 'ক' (একজন শিল্পী) কে বলতে পারি?

সকল কিছুই শিল্প-সৌন্দর্যময় হয়ে উঠতে পারে যদি তা করা যায় শিল্পীসুলভ দৃষ্টিতে। ২৭ এপ্রিল ১৯৬৬

*

সৌন্দর্য এক মহান শক্তি।

*

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের রয়েছে এক সঞ্চরণশীল শক্তি।

*

সৌন্দর্য কখনই তার পরিপূর্ণতাকে লাভ করে না যতক্ষণ না তাকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা হয়।

*

আগামী দিনের সৌন্দর্য: সৌন্দর্য যখন ভগবৎ শক্তিকে প্রকাশ করবে।

*

আগামীদিনের সৌন্দর্য যা ভগবানকে প্রকাশ করে তুলবে: এমন একটি সৌন্দর্য যার অস্তিত্ব থাকে কেবল ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানের জন্য।

*

সৌন্দর্য তার নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ নয়, এটি হয়ে উঠতে চায় দিব্য।

*

সৌন্দর্যের পূর্ণতাকে অর্জন করা যায় একমাত্র এক মহৎ শুদ্ধিকরণের ভিতর দিয়ে।

*

সৌন্দর্যের আদর্শ এগিয়ে চলে তার সীমাহীন লক্ষ্যের দিকে।

*

জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস হচ্ছে তাই যেগুলি তোমাদের পার্থিব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাও না। ১০-১১-১৯৬৯

সর্বজনীন বিষয়সমূহ[২]

(নির্বাচিত অংশ)

শ্রীমা

আশাবাদ: এটি অনেক বেশি সাহায্যকারী এর বিপরীত ভাবনার তুলনায়।

*

মানসিক ঔৎসুক্যকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তা বিপজ্জনক হয়ে না ওঠে।

*

শারীরিক কৌতূহলের গুণমান নির্ভর করে তার উদ্দেশ্যের উপর।

*

সংযম: একটু নীতিপরায়ণ ও গর্বিত, এটি খুবই গুরুগম্ভীর, চাপা।

*

একটি প্রচেষ্টা অতি ছোট্ট বিষয়, কিন্তু এটি ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতিময় হয়ে উঠতে পারে।

*

আবিষ্কারের কোন মূল্যই নেই যদি না সেগুলি ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

*

একমাত্র ভগবানের কর্ম ব্যতীত সোনাকে কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

*

পরহিত: সরল সহজ এবং মধুময়, প্রত্যেকের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী।

*

নিঃস্বার্থপরতা: গভীরভাবে খুলে ধরা যাতে কোনকিছুই প্রত্যাখ্যাত না হয়।

উৎস: ১,২,৩:*Words of the Mother,* Cent. Edi. Vol. No.5,

অনুবাদ : অরুণ বসাক

পিছনে সরে আসা

শ্রীমা

তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্তার বহির্ভাগে বেঁচে থাক, বাইরের প্রভাবস্পর্শের কাছে অনাবৃত হয়ে। এমনকি বলা যায় তোমরা প্রায় নিজের শরীরের বাইরেই থাক এবং যখন কোন একটি অপ্রীতিকর ব্যক্তির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, যে ব্যক্তিটিও ওইরকমভাবে বাইরে প্রক্ষিপ্ত, তুমি একেবারে বিচলিত হয়ে পড়। পুরো সমস্যাটার উদ্ভব হচ্ছে কেননা তোমার পিছনে সরে আসার অভ্যাস নেই। তোমাকে সর্বদা নিজের ভিতরে ফিরে আসতে হবে—ভিতরে গভীরে যেতে শেখ—সরে এস, তাহলে নিরাপদে থাকবে। বহির্জগতের যে-সব শক্তি উপর উপর ঘুরে বেড়ায় সেসবে নিজেকে লিপ্ত করবে না। এমনকি যখন তোমার খুব তাড়া থাকে, একটু সময়ের জন্য ভিতরে যাও, আশ্চর্য হয়ে যাবে—আবিষ্কার করবে কি তাড়াতাড়ি এবং কি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারা যায়। যখন কেউ তোমার উপরে রেগে গিয়েছে, তার রাগের স্পন্দনে ধরা দিও না, শুধু পিছনে সরে এস, দেখবে তার রাগ কোনরকম অবলম্বন বা সাড়া না পেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। সবসময় শান্তি বজায় রাখবে, তাকে খোওয়ানোর সবরকম অজুহাত প্রত্যাখ্যান করবে। ভিতরে সরে না এসে কখনো কিছু সিদ্ধান্ত নেবে না, ভিতরে সরে না এসে কখনো একটি কথা বলবে না, ভিতরে সরে না এসে কখনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। সাধারণ জগতে যাকিছু আছে সবই অস্থায়ী এবং পলায়নপর, কাজেই সেখানে এমন কিছু নেই যে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ বিচলিত হতে হবে। যা হল স্থায়ী চিরন্তন, অমর, অনন্ত—হ্যাঁ, সেটাই রাখার যোগ্য, জয় করার উপযুক্ত, তা-ই অধিগত করার অর্থ হয়। তা হচ্ছে দিব্য আলো, দিব্য প্রেম, দিব্য জীবন—তা আবার পরম শান্তি, পূর্ণ আনন্দ এবং সর্ব-ঈশিতা এই পৃথিবীতে এবং সেইসঙ্গে চরম প্রাপ্তি হিসাবে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব। তুমি যখন জিনিসগুলোর আপেক্ষিকতা বুঝতে পার, তখন যাই ঘটুক না কেন, তুমি পিছনে সরে এসে দেখতে পার, তুমি শান্ত থেকে দিব্যশক্তিকে আহ্বান করতে পার এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা কর। তখন তুমি জানতে পারবে তোমার ঠিক কি করা উচিত। কাজেই, মনে রাখবে যদি-না তুমি খুব শান্তিপূর্ণ থাক, তবে তুমি কোন উত্তর পাবে না। অন্তরের শান্তি অভ্যাস কর, অন্তত সামান্যভাবে একটু আরম্ভ কর এবং অভ্যাস ক'রে চল, যতক্ষণ না ওটা তোমার স্বভাবের অঙ্গ হচ্ছে।

উৎস: *Questions and Answers,* Cent. Edi. Vol. No.3, P.160,

অনুবাদ : পীযুষ গুপ্ত

''মানুষ প্রায়ই কর্মের সজাগ সাক্ষী হয় না। তাই বলি জীবন প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা হতে চাইলে প্রথমেই দেখতে হবে কি হচ্ছে।''

—শ্রীমা

সচরাচর আপনা-আপনি না ভেবেচিন্তে মনোযোগ না দিয়ে কাজকর্ম করা হয়, তাই তুমি যদি জানতে চাও কি করে কাজটা হচ্ছে তাহলে দেখবে কাজের ধারা তোমার কাছে স্পষ্ট হতে বেশ একটু সময় নেবে। জীবনধারণের অভ্যাস মানুষের এমনই সহজাত যে কেমন করে তা ঘটে তা-ও সে জানে না। জীবনের ক্রিয়া জীবনের গতি এইসবই স্বতপ্রবৃত্ত স্বয়ংচল, প্রায় বুঝি অচেতন, বুঝি-বা অর্ধচেতনায় ঢাকা। আর এই সহজ কথাটা লোকের মনেই পড়ে না যে, কোন কিছু করবার আগে জানতে হবে কি করতে যাচ্ছি, তারপর থাকতে হবে করবার ইচ্ছা। কেবল যখন কর্মের কোন একটি উপাদানে ক্রিয়াবৈকল্য দেখা দেয়—যেমন মনের মধ্যে পরিকল্পনা গড়বার কিংবা তাকে কার্যকরী করবার ক্ষমতার অভাব—এই দুটি জিনিসে ক্রিয়াবৈকল্য দেখা দিলে, আপন সত্তার সুষ্ঠু ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ভাবনা জাগে। মনে কর একদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখলে বিছানায় শুয়ে আছ। কিন্তু তুমি জানলে না কিংবা তুমি মনে করতে পারলে না যে তোমাকে উঠতে হবে, জামাকাপড় পরতে হবে, এটা বা ওটা করতে হবে। তখন তুমি বিস্মিত হয়ে ভাববে, ''আশ্চর্য, এ হচ্ছে কি! কোথাও একটা গোলযোগ হয়ে গেছে। আমি ভুলে গেছি কি করতে হবে। কিছু একটা বিকল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।''

তারপর ধর, তুমি জানতে পারলে কি তোমার করণীয়। বুঝতে পারলে তোমাকে উঠতে হবে, স্নানের ঘরে যেতে হবে, জামাকাপড় পরতে হবে; কিন্তু একথা বুঝতে পেরেও, ধর, তুমি কিছুই করতে পারলে না : একটা কিছু ঘটেছে ইচ্ছার কলটা বিকল হয়ে গেছে, শরীরের উপর ইচ্ছার প্রভাব নেই। তুমি ভাবনা শুরু করে দিলে। ভাবতে লাগলে, ''আশ্চর্য তো! আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম নাকি?''

এরকম না হলে তুমি বুঝতে পারবে না যে এভাবেই চলে জীবনের কর্মধারা। বাঁচাটা তোমার কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে বোধ হয়; তুমি ভাব, ''চলছে—চলবে।'' তার মানে কাজকর্মের বেলা লোক অর্ধচেতনও নয়। সবই চলে আপনা-আপনি, বুঝি-বা এক নিশ্চিন্ত অভ্যাসের বশে। মানুষ প্রায়ই কর্মের সজাগ সাক্ষী হয় না। তাই বলি, জীবন প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা হতে চাইলে প্রথমেই তোমাকে দেখতে হবে কি হচ্ছে।

এজন্যই হয়তো সবকিছু মঙ্গলমতো সম্পন্ন হয় না। কেননা সবকিছুই যদি বিধিবৎ স্বাভাবিক ছন্দে চলত তাহলে কর্মসম্বন্ধে আমাদের সজাগতা থাকত না। কাজ করে যেতাম অভ্যাসবশে সংস্কারের বশে আপন আবেগে না-ভেবেচিন্তে। আমরা হতে

পারতাম না কর্মের সাক্ষী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণও সম্ভবপর হত না। কর্ম তাহলে অনির্দিষ্ট একটা কিছু বলে মনে হ'ত; কর্ম হ'ত অন্তরালের এক অস্পষ্ট চেতনার বহিঃপ্রকাশ, সেই প্রকাশ ঘটে যেত আমাদের অজান্তেই, আমরা বুঝতেও পারতাম না আমরা কাজ করছি, আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হ'ত। এরকম হলে, কখনো যদি কোন একটা অপরিচিত বা অজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাব হয়, সেই শক্তি তোমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে পারবে, কি প্রকারে তোমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে তার আভাসও তুমি পাবে না। সত্যি বলতে কি, সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনপ্রক্রিয়ার ধর্ম, জীবনের গতি, জীবনের নিয়ম আমাদের অধিগত হচ্ছে, ততক্ষণ নিয়ন্ত্রণ শুরু করা যাবে না। নইলে নিয়ন্ত্রণের কথা আমরা আদৌ ভাববই না। কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে,—যেমন ধর, এমন একটা কাজ করতে উদ্যত হয়েছ যার ফল অনির্দিষ্টকর হতে পারে,— তখন তোমার মনে হবে, ''তাই তো! এ কাজ থেকে আমাকে বিরত থাকতে হবে।'' আর তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যে জীবন নির্বাহের ব্যাপারেও আছে এক বিস্তারিত বিধিব্যবস্থা, আছে শাস্ত্রনীতি। আর জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য সেই শাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজনীয়। অন্যথায় দেখবে, তোমরা বুঝি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার, বেগ-সবেগের একটা সমষ্টি মাত্র, কমবেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু তোমরা মোটেই জানতে পারবে না কি করে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আর এজন্যই সত্তার মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, জীবনে দেখা যায় নানাবিধ আপাত বিশৃঙ্খলা। ছোট-ছোট শিশুর চেতনার উপাদানও এই রকমের। ছোট শিশু সম্পূর্ণ অচেতন, ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে সে সবকিছু উপলব্ধি করতে শুরু করে। কিন্তু বিশেষভাবে শিক্ষা না দিলে, চেষ্টা না করলে দেখা যায় কি করে বেঁচে আছে তা না বুঝেই অনেকে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা জীবন সম্বন্ধে সজাগ হয় না।

এরকম অবস্থায় যা-কিছু ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু জড়বিশ্বে আত্মসচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে এই হল প্রথম ক্ষুদ্র পদক্ষেপ।

প্রথমে দেখা যায় নানা অস্পষ্ট চিন্তা নানা অস্পষ্ট অনুভব। সেগুলি সত্তার মধ্যে কমবেশি (বেশির চেয়ে কমই বলতে পার) ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিপুষ্ট হতে থাকে। সেই পরিপুষ্টির কিছু কিছু আভাসও পাওয়া যায়। আগুনে হাত দিয়ে পুড়ে গেলে সে বুঝতে পারে কিছু একটা ঠিক ঠিক চলছে না, পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলেও বুঝতে পারে কিছু একটা ঠিক ঠিক চলছে না। তখন সে ভাবতে শুরু করে—অমুক অমুক ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে যাতে পুড়ে না যায়, পড়ে না যায়, যাতে হাত-পা কেটে না যায়...ধীরে ধীরে বহির্বিশ্বের জ্ঞান বাড়লে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ দৃঢ়তর হলে সেই সতর্কতা স্থায়িত্ব লাভ করে। নইলে মানুষ থেকে যেত অর্ধচেতন একটা পিণ্ড, চলাফেরা করত কিন্তু

জানত না কি করে কি হচ্ছে, কেনই বা হচ্ছে।

এই হল আদিম অচেতন অবস্থা থেকে নির্গমনের অতি নগণ্য এক সূত্রপাত।

উৎস:Cent.Edi.Vol.No.9

সবার আগে তোমায় জানতে হবে তোমার চেতনাটি কি বস্তু

শ্রীমা

...সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কি বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্টস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে করতে পারা যায়। কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ একটি সকলেরই জানা আছে তাহ'লে, নিজেকে লক্ষ্য করা এবং সতর্কভাবে নিজের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা আর তখন বুঝতে চেষ্টা করা তোমার এই দেহটি সেটিই কি সত্তার চেতনা যাকে তুমি বল ''আমি''। আর তারপর যখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে দেহটি একেবারেই তা নয়, এবং দেহ অন্য কিছুকে প্রকাশ করে, তখন তুমি তোমার ভাবাবেগ উত্তেজনা প্রভৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করতে চেষ্টা কর সেগুলিই চেতনা কিনা, আর তারপর আবার তুমি বুঝতে পার সত্যিই তা নয়। তখন তুমি তোমার চিন্তার মধ্যে খোঁজ কর যে, চিন্তাই সত্যিকারের তুমি কিনা যাকে তুমি বল স্বয়ং ''আমি''। তারপর খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পার যে ''না, আমিই চিন্তা করছি, সুতরাং আমার চিন্তাগুলি থেকে আমি পৃথক''। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বর্জন করে করে তুমি কোন একটি বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে সফলকাম হও, যেটি এমন একটি কিছু যা তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করায়, ''হ্যাঁ, এই হল স্বয়ং 'আমি'। এটি এমন কিছু যাকে আমি চর্তুদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি। এটিকে আমি আমার দেহ থেকে প্রাণে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, মনে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং এমনকি যদি...কিভাবে বলি—যদি এই সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাপারে খুব অভ্যস্ত হয়ে থাক তাহলে এটিকে আমি অন্য লোকেদের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি, আর ঠিক এইভাবে আমি নিজেকে অন্যান্য বস্তু এবং লোকেদের সঙ্গে মিলিয়ে এক করে দিতে পারি। আমার আস্পৃহার সাহায্যে এটিকে আমার দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করতে পারি এবং তাকে ঊর্ধ্বের সব রাজ্যের দিকে ওঠাতে পারি যেটি মোটেই আর ক্ষুদ্র দেহটি নয় এবং দেহের মধ্যে যেসব বস্তু রয়েছে তাও নয়।'' আর তখন মানুষ বুঝতে আরম্ভ করে চেতনা কি বস্তু। এর পরে মানুষ বলতে পারে, ''বেশ তো, আমার চেতনাকে আমার চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাকে সেইখানেই রেখে দেব যাতে সে ভগবানের সঙ্গে একসুরে বাঁধা হতে পারবে এবং অখণ্ডভাবে

তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবে।'' অথবা ''যদি আমার চিন্তার সামর্থ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠবার অভ্যাসের দ্বারা আমি বিশুদ্ধ জ্যোতির, বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি...'' তাহলে মানুষ তার চেতনাকে সেইখানে স্থাপন করতে পারে এবং প্রদীপ্ত জ্যোতির রাজ্যে সেইভাবে বাস করতে পারে। সে রাজ্যটি হল বাহ্য দেহের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

কিন্তু প্রথম এই চেতনাটিকে গতিশীল হতে হবে, এবং সত্তার অন্যান্য অংশগুলি যথার্থতঃ হল চেতনারই যন্ত্র এবং প্রকাশ করায় উপায়, তার থেকে কিভাবে এটিকে পৃথক করা যায় তা তাকে জানতে হবে। চেতনা এই বস্তুগুলিকে ব্যবহার করবে কিন্তু এইগুলিকেই চেতনা বলে ভুল করবে না। তুমি এই সব বস্তুর মধ্যে চেতনাকে প্রয়োগ কর, এবং তোমার একাত্ম হবার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তোমার দেহ সম্বন্ধে সচেতন হও, তোমার প্রাণ সম্বন্ধে সচেতন হও, তোমার মন সম্বন্ধে সচেতন হও এবং তোমার সবকিছু ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হও। কিন্তু তার জন্যে প্রথমেই যেটি দরকার তা হচ্ছে তোমার চেতনা সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে যাবে না, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলবে না এবং তাদের সঙ্গে একজোট হবে না অর্থাৎ সেগুলিকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

মানুষ যখন নিজের সম্বন্ধে ভাবে, সে মনে করে, ''আমার এই যে দেহ এটাই তো হল স্বয়ং আমি। তাই আমি হলাম এই রকম, আর আমার যে প্রতিবেশী সেও হল তার দেহটা। আমি যখন অন্য কারো সম্বন্ধে বলি তখন, আমি তার দেহটি সম্বন্ধেই বলি।'' (সত্যি বলতে কি, হয়ত দশ লক্ষের মধ্যে দশজনও এর ব্যতিক্রম নয়)। তাই যতকাল মানুষ এই অবস্থায় বাস করে সে জীবনের সম্ভাব্য সকলরকম গতিবৃত্তির খেলার পুতুল মাত্র, আর তার আত্মসংযম বলে কোন কিছুই থাকে না।

দেহটি হল শেষ যন্ত্র, এবং তথাপি বেশিরভাগ সময়ই মানুষ এইটিকেই বলে ''স্বয়ং আমি'' যদি না সে গভীরভাবে চিন্তা করে।

উৎস: Cent.Edi.Vol.No.7

মাগো, ভালোবাসার সেই উৎসকে কেমন করে পাব যা আমাকে বোঝাবে যে সর্বদা সর্বত্রই রয়েছে ভগবানের উপস্থিতি?

তোমার মাঝে সবার আগে পেতে হবে ভগবানকে—তাঁকে পেতে পার আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা ও একাগ্রতায় কিংবা শ্রীঅরবিন্দ ও আমার প্রতি ভালোবাসা ও আত্মদানের মাধ্যমে... একবার যদি ভগবানকে পাও তাহলে সর্বত্র সর্ববস্তুর মধ্যে তুমি তাঁকে দেখবে।

উৎস: Cent.Edi., অনুবাদ: কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা

(নির্বাচিত অংশ)

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এর পর)

প্র: নিচে অনেকগুলো প্রার্থনা লিখে জানাচ্ছি, সেগুলো বাহ্য বা আভ্যন্তর, সঠিক অথবা বেঠিক, অনুকূল অথবা প্রতিকূল, সেগুলির সংশোধনের দরকার কিনা দয়া ক'রে যদি জানিয়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো—

১। রাত্রে পড়তে বসে যখন ঘুম আসে, মাকে প্রার্থনা করি যে ঘুম ছাড়িয়ে দিন।

উ: যদি তোমার সেই পড়া সাধনার অন্তর্গত হয় তাহলে ঠিকই করো।

২। ঘুমোতে যাবার সময় মাকে প্রার্থনা করি যেন তিনি ঘুমের মধ্যে আমার সাধনার ভার নেন, আমার ঘুম যেন চেতনাময় ও জ্যোতিপূর্ণ হয়, ঘুমের সময় যেন তিনি আমাকে রক্ষা ক'রে তাঁর সম্বন্ধে চেতন রাখেন।

৩। ঘুমের মধ্যে যখনই জেগে উঠি তখনই বলি মা কাছে থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

উ: এ দুটি সাধনারই অঙ্গ।

৪। বাইরে বেরোতে এবং বেড়াতে যাবার সময় প্রার্থনা করি মা আমাকে আরো তেজ এবং সামর্থ্য দিন, আরো শক্তি এবং স্বাস্থ্য দিন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

উ: শক্তি ও সামর্থ্য যদি চাও সাধনার জন্য ও সাধনার যন্ত্রগুলির জন্য তাহলে তা ঠিক।

৫। রাস্তায় চলতে কুকুর তেড়ে আসছে দেখলে আমি তখন মাকে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে রক্ষা করেন, আমার ভয় ভেঙে দেন।

উ: রক্ষার জন্য প্রার্থনা সব সময়ই ন্যায্য। ভয় ভাঙার কথা সাধনারই অন্তর্গত।

৬। খেতে যখন বসি তখন প্রার্থনা করি যেন প্রতি খাদ্যকণা মাকে নিবেদন করি, সব কিছু যেন সহজে হজম হয়; খাদ্য সম্বন্ধে যেন আমার মধ্যে সমতাবোধ এবং অপক্ষপাত আসে, যেন লোভ না ক'রে সকল রকম খাদ্যেই সমান রস ও আনন্দ পাই।

উ: এ প্রার্থনাও সাধনারই অন্তর্গত।

৭। কাজে যখন যাই তখন প্রার্থনা করি মায়ের শক্তি আমার কাজের ভার নিন, সুচারু ভাবে ও যত্নের সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে কাজটি করে যেতে আমাকে সাহায্য করুন, নিজের অহং এবং কামনাকে বাদ দিয়ে মায়ের স্মৃতি বজায় রেখে এই বোধ নিয়ে যেন

কাজ করি যে তিনিই আমার কাজে সমর্থন করছেন।

উ: এও সাধনারই অন্তর্গত।

৮। কাজের বিরতির সময় প্রার্থনা করি শক্তি সাহায্য ও স্মৃতিরক্ষার জন্য।

উ: এও সাধনারই অন্তর্গত।

৯। মন্দ বা নোংরা চিন্তা ও তদনুরূপ অনুভব যখন আসে তখন প্রার্থনা করি তার থেকে মুক্তি ও শুদ্ধির জন্য।

উ: এও সাধনারই অন্তর্গত।

১০। যখন পড়তে বসি তখন প্রার্থনা করি যেন শীঘ্র বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারি।

উ: সাধনার বা সাধনার যন্ত্রগুলির উন্নতির পক্ষে যদি করা হয় তাহলে তা ঠিকই।

১১। কাজে কোনো ভুল করলে প্রার্থনা করি যেন আরো সচেতন ও নির্ভুল হই।

উ: এও সাধনার অঙ্গ।

১২। বন্ধুকে পার্সেলে প্রসাদ পাঠাবার জন্য যখন পোষ্টঅফিসে যাই রেজিস্ট্রি করতে তখন প্রার্থনা করি যেন সেটা পৌঁছতে বিলম্ব না হয়।

উ: সাধনার জীবনে সময়ের ক্ষতি নিবারণ করার জন্য হলে তা ঠিকই।

১৩। ধ্যানে বসে প্রার্থনা করি মায়ের শক্তি যেন ধ্যানের ভার নিয়ে তা গভীর, অটুট, একাগ্র এবং অবান্তর চিন্তা বর্জিত ক'রে দেন, অস্থিরতা প্রভৃতি নিবারণ করেন।

উ: এও সাধনারই অংশ।

১৪। হতাশা, নিরুদ্যম, বিঘ্নবিপদ, ভুল চিন্তা, সন্দেহ, জড়তা বা ঐ ধরনের কিছু এলে প্রার্থনা করি যেন মা সৎসাহস ও বিশ্বাসকে বজায় রেখে ওগুলো সব কাটিয়ে দেন।

উ: এও সাধনার অন্তর্গত।

১৫। অন্যান্য সময় প্রার্থনা করি যেন আমার মধ্যে শান্তি, শক্তি, আলো প্রভৃতি দিয়ে ভরিয়ে দেন, আমাকে শক্তিসামর্থ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

উ: এও সাধনার অংশ।

(ক্রমশ)

উৎস: *On Himself,* মূল অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

যোগপথের বাধাবিঘ্ন

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২২-এর পর)

তুমি কি তোমার আন্তর আত্ম-দর্শনের বুদ্ধিগত-নীতিমূলক বিবরণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছ? শুষ্ক? পুলিশম্যান? অপরাধী? হায় ভগবান! যদি সত্যি তাই হোত, তাহলে তা মোটেই আত্ম-দর্শন হতে পারতো না—কেননা যথার্থ আত্ম-দর্শনের মাঝে আদপেই কোনরকম পুলিশী ব্যাপার এবং অপরাধপ্রবণতার উপস্থিতি থাকে না। সেগুলি সমস্তই বুদ্ধিগত-নীতিমূলক পুণ্য ও পাপের কৌশল যা কেবল বাহ্যজীবনের জন্য ব্যবহারিক মূল্যবোধের এক মানসিক রচনা মাত্র, কিন্তু তা সত্যকার আন্তর মূল্যবোধের অন্তর্গত কোন সত্য নয়। বিশুদ্ধ আত্ম-দর্শনের মাঝে আমরা কেবলমাত্র সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যকেই দেখি এবং অশুদ্ধ সুরটিকে যথার্থভাবে স্থাপন করি, আর সেইসঙ্গে নির্ভুল সুরটির দ্বারা সেটিকে প্রতিস্থাপিত করি। কিন্তু সত্যতার কারণে আমি একথা বলছি যে আত্ম-দর্শনের প্রচেষ্টা শুরু করবার জন্য তোমাকে যুক্তির দ্বারা সম্মত না করান; কেননা যদি তুমি সেটি সম্বন্ধে তোমার এই সমস্ত ধারণা নিয়ে তা শুরু কর, তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি পুলিশম্যানের ভিত্তিতে তা শুরু করবে এবং সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে।এ ভিন্ন, স্পষ্টতঃই, যোগসাধনার ক্ষেত্রে তুমি পিয়ানো হয়ে ওঠাকেই বেশী পছন্দ কর, পিয়ানোবাদক হওয়াকে নয়, যে মনোভঙ্গীটি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু তা পূর্ণ আত্ম-দান এবং সেই পরম বাদক ও সুরজ্ঞের হস্তক্ষেপকে বিজড়িত করে নেয়। কামনা করি তাই যেন হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকটি মানুষই এই সমস্ত বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে সে একজন ব্যক্তি বটে, কিন্তু একইসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত—বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের কাছে বহুবিধ ব্যক্তিত্বের বোধ পরিচিত হয়ে উঠছে—সাধারণভাবে যারা যথার্থই পরস্পরের মতের সঙ্গে একমত হন না। যতদিন পর্যন্ত না একজন একটি প্রধান অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে একত্বকে লক্ষ্যবস্তু করে না নেয়, যেমন ভগবানকে খোঁজা এবং তাঁর কাছে আত্মোৎসর্গ করা, তার পরিবর্তে তারা কোনক্রমে অগ্রসর হয়, দ্রুত দিক্ পরিবর্তন কিংবা কলহ করে অথবা সবকিছুকে আবিল করে তোলে অথবা অন্যথায় একজন কর্তৃত্ব করে এবং অন্যদের গৌণস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করে তোলে—কিন্তু একবার যখন তুমি তাদের এক লক্ষ্যের অভিমুখে মিলিত করবার চেষ্টা কর তখনই সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

সাত

বাহ্য বিষয়ের প্রতি তুমি অতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না; এই হল সেই মনোভঙ্গী

যা তোমাকে দিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এত অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত করছে। আমি একথা বলব না যে পরিবেশ সাহায্য কিংবা নিবারণ করতে পারে না—কিন্তু সেগুলি হল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তারা মূলগত বিষয় নয় যা আমাদের মাঝেই নিহিত রয়েছে, কাজেই পরিপার্শ্বের সাহায্য অথবা তাদের প্রতিরোধের আবশ্যক হয়ে ওঠাটি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যোগের ক্ষেত্রে, ঠিক যেমন মহৎ অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি মানবীয় প্রচেষ্টায়, সর্বদা বিরুদ্ধশক্তিদের হস্তক্ষেপের এবং প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার আধিক্য হতে বাধ্য যেগুলিকে অতিক্রম করতে হবে। তাদের অত্যধিক বেশী কোন গুরুত্ব দেওয়া সেগুলির গুরুত্ব ও শক্তিকেই বাড়িয়ে তোলে যাতে তারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে, তাদের নিজেদের মধ্যে তা যেন আত্মবিশ্বাসকে এনে দেয় এবং সেই সঙ্গে নিয়ে আসে ফিরে আসবার অভ্যাসকে। সমতার সঙ্গে তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য—যদি একজন তাদের বিরুদ্ধে এক সানন্দ দৃঢ়তাকে যা আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়নিশ্চয় সঙ্কল্পে পূর্ণ তা ব্যবহার করতে না পারে—পরিবর্তে যদি সে সেগুলির গুরুত্ব ও প্রভাবকে খর্ব করে তোলে, সেক্ষেত্রে, যদিও তৎক্ষণাৎ নয় অন্তিমে তাদের একগুঁয়েমী ও প্রত্যাবর্তন হতে তাকে মুক্ত করে তুলবে। কাজেই যোগসাধনার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হল আমাদের অন্তরের গভীরে যে নির্ণায়ক শক্তিটি বিরাজ করছে তাকে চিনতে পারা---কেননা সেটিই হল গভীরতর সত্য—সেইসঙ্গে বাহ্য পরিবেশের শক্তির বিরুদ্ধে সেই সত্যকে যথার্থ ভাবে স্থাপন করা এবং আন্তর বলকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা। শক্তির অস্তিত্বটি হল সেখানেই —এমনকি সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তা সত্য;একজনকে সেটি আবিষ্কার করতে ও তার আবরণটিকে উন্মোচিত করতে হবে এবং সমগ্র যাত্রাপথ ও সংগ্রামটির আগাগোড়া সেই শক্তিকে সম্মুখে স্থাপন করে রাখতে হবে।

*

একটি প্রতিরক্ষামূলক সংগঠিত দলের অর্থ হল এই যে সেখানে গৃহযুদ্ধের[১] সত্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া। সাধকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তার কখনো গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা উচিত নয়। একজন সাধক সর্বদা স্মরণে রাখবে যে সবকিছুই আন্তর মনোভঙ্গীর উপর নির্ভর করে; যদি ভগবৎকৃপার উপর তার এক যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে আবিষ্কার করবে যে ভগবৎকৃপা প্রত্যেক পদক্ষেপে তাকে দিয়ে সঠিক কাজটি করিয়ে নেবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বাড়ির মধ্যে অবস্থান করাটি তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবে; আর যদি বাইরে তার জন্য কোন বিপদ থেকে থাকে তাহলে সে বাড়ির মধ্যেই অবস্থান করবে। ভগবৎকৃপা তাকে ঠিক সেই কাজটি করতে সহায়তা করবে যাতে সে বিপদকে এড়িয়ে যেতে

[১]ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পূর্বে বঙ্গদেশে দাঙ্গার সময়ে লিখিত।

পারে। কিন্তু সেই ধরনের বিষয় ঘটবার ক্ষেত্রে, তোমার মধ্যে অবশ্যই সমগ্র সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করে এক দৃঢ় প্রোথিত বিশ্বাস অবস্থান করবে, তোমার মধ্যস্থিত অন্য কোন গতিবৃত্তি যার বিরোধিতা করবে না। আর স্বাভাবিকভাবেই এটি কঠিন ব্যাপার। এছাড়াও, তোমার মাঝে হয়তো নিজের জন্য এই বিশ্বাসটি উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু তোমার চারিদিকে অন্যরা রয়েছে যারা তোমার মনোভঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবে না। তাদের মাঝখানে অবস্থানকালীন তুমি হয়ত কার্যসাধনের জন্য বাহ্য উপায়কে মেনে নিতে বাধ্য হতে পার, যেমন তুমি যা বলেছ কোন প্রতিরক্ষামূলক সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া। এমনকি সেক্ষেত্রেও, তুমি অবশ্যই তোমার মনের মাঝে বহন করবে যে যা কিছুকে গণ্য করা হবে তা হল শুধুমাত্র তোমার আন্তর মনোভঙ্গী ও বিশ্বাস। সকল বাহ্য উপায়গুলির অর্থ হল শূন্য, সেগুলি নিশ্চিতভাবে নিরর্থকরূপে প্রমাণিত হতে পারে এবং সেইসঙ্গে বৃথা বলে পরিগণিত হতে পারে, একমাত্র ভগবৎকৃপাই তোমাকে রক্ষা করতে পারেন।

*

একটি বাধা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ওটিই হল অসুবিধা,—এটি একজনকে ধরবার জন্য ছুটে চলে,—কিংবা বরং একজন প্রতিবন্ধকটিকে তার নিজের সঙ্গেই বহন করে থাকে, কেননা প্রতিবন্ধকটি যথার্থই ভিতরে অবস্থান করছে, বাইরে নয়। বাহ্য অবস্থাগুলি প্রতিবন্ধকটিকে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য কেবলমাত্র সুযোগ এনে দেয় এবং যতদিন পর্যন্ত না আন্তর বাধাটিকে জয় করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অবস্থাগুলি সর্বদা একভাবে অথবা অন্যভাবে প্রকাশ হয়।

*

'ক'-এর ক্ষেত্রে এই সমস্ত যা কিছু ঘটছে, ওটিই হল তার প্রকৃত কারণ। যখন প্রকৃতির মাঝে এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে যাকে অতিক্রম করতে হবে, তখন প্রকৃতি সর্বদা নিজের উপর বিভিন্ন ঘটনাবলীকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে, যা তাকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দেয়, যতদিন পর্যন্ত না সাধক সেটিকে জয় করতে সক্ষম হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে মুক্ত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে যদি সেই ব্যক্তি অতিক্রম করবার জন্য এক আন্তরিক প্রচেষ্টায় রত থাকে, তখন অন্ততঃপক্ষে যা প্রায়শঃই ঘটে থাকে তা হল এই বিষয়টি। একজন সর্বদা জানতে পারে না যে যারা তার সঙ্কল্পটিকে ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করছে অথবা সঙ্কল্পটিকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলছে (কেননা তারা এই কাজটি করবার অধিকারকে দাবী করে থাকে) তারা বিরুদ্ধ শক্তি কিনা, কিংবা আমাদের একথা বলতে দাও যে, তারা কি দেবতা, যারা একাজটি করছে যাতে উন্নতিসাধনকে চাপ দেওয়া ও ত্বরান্বিত করা যায় অথবা সেই পরিবর্তনের নিশ্চয়তা ও সম্পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া যায় যে পরিবর্তনের জন্য পরবর্তীকালে আস্পৃহা করতে হবে। সম্ভবতঃ এটি

সবাইকেই সাহায্য করে, যখন একজন বিষয়টিকে শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রহণ করে থাকে। (ক্রমশ)

উৎস: *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, PP. 1695-98,
অনুবাদ : দেবযানী সেনগুপ্ত

প্রাণের রূপান্তর

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২২-এরপর)

এ হল সাধকদের মধ্যেকার একটি সাধারণ ব্যধি—আর তা হল ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার অনুভূতি নিয়ে অন্যদের সাথে তুলনা করে দেখা অনেকের মধ্যে ব্যাপারটি বিদ্রোহ ও আত্ম-জাহির-এর দিকে পরিচালিত হয়, আবার অন্যদের ক্ষেত্রে আত্ম-নিন্দা ও বিষণ্ণতার অভিমুখে ধাবিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, এই সমস্ত অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং যে বিচার করা হয় তা সীমার বাইরে অবস্থিত। প্রত্যেক সাধকেরই তার নিজস্ব গতিবৃত্তি রয়েছে, রয়েছে ভগবানের সাথে তার নিজস্ব সম্পর্ক, তার কর্মের মাঝে অথবা সাধারণ সাধনার মধ্যে তার নিজস্ব স্থান এবং সেক্ষেত্রে অন্যদের সাথে তুলনা করাটি অবিলম্বে সেসমস্ত কিছুর উৎকর্ষতার মাঝে এক ভ্রান্তিকে নিয়ে আসবে। তার নিজস্ব আন্তর গতিবৃত্তির সত্যের উপরেই তাকে তার ভিত্তিকে গ্রহণ করতে হবে—*স্বধর্ম*।

*

আত্ম-শ্রদ্ধা এবং এক শ্রেষ্ঠত্বের বোধ হল যথার্থই দুটি ভিন্ন জিনিস। আত্ম-শ্রদ্ধার অনুপস্থিতি যেমন অহং থেকে মুক্তিলাভ করবার একটি চিহ্ন, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে আত্ম-শ্রদ্ধাও অবশ্যম্ভাবীরূপে অহং-এর কোন চিহ্ন নয়। আত্ম-শ্রদ্ধার অর্থ হল আচার-ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট মানকে রক্ষা করে চলা যা মানবত্বের স্তর অনুযায়ী যথার্থ, যে স্তরে আমি অবস্থান করে থাকি—উদাহরণস্বরূপ আত্ম-শ্রদ্ধার দরুন আমি কোন ভ্রান্ত বিবৃতিকে গড়ে তুলতে পারি না এমনকি যদি তা করলে সুবিধাজনক ফল লাভ হতে পারতো সেক্ষেত্রেও এবং বেশীরভাগ মানুষই এই অবস্থার মাঝে পড়লে সেটিই করবে। *আত্ম-সম্মান* হল ভিন্ন বস্তু এবং তা সাত্ত্বিক প্রকৃতির অহং-এর অঙ্গীভূত। যখন একজন তার অহং থেকে মুক্ত হয়ে ওঠেনি, তখন *আত্ম-সম্মান* (সেইসঙ্গে আত্ম-শ্রদ্ধা—কেননা সেটি অহং-পূর্ণ অথবা অহংবর্জিত উভয়ই হতে পারে) ব্যক্তিত্বের রক্ষণের জন্য তার যথার্থ স্তরটিতে অপরিহার্য অবলম্বন হয়ে ওঠে।

ঘৃণা প্রকৃতই অনাধ্যত্মিক হওয়ার কারণে সেই উদ্দেশ্যটির ক্ষেত্রে তা আহ্বান জানানোর মত কোন সহায় নয়।

*

অনেক সাধকদের ক্ষেত্রে মন অথবা উচ্চপ্রাণ দ্বারা পরিচালিত একটি প্রাথমিক পর্যায় থাকে যে পর্যায়টিতে তাদের সাধনা খুব ভালভাবেই চলে, কেননা মন এবং উচ্চপ্রাণের মাঝে কিছু কিছু উপাদানের উপস্থিতি থাকে যেগুলি সত্তার অবশিষ্ট অংশকে নিয়ন্ত্রণ করবার পক্ষে যথেষ্টই শক্তিশালী, যে সময়টিতে প্রথম-অভিজ্ঞতাসমূহ অথবা প্রাথমিক উন্নতি গড়ে ওঠে। কিন্তু একটি সময় আসে যখন সাধককে সত্তার নিম্নতন অংশগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, আর *তখনই* সকল প্রাণময় বাধাবিঘ্নগুলি জেগে ওঠে। যদি প্রারম্ভিক উন্নতি কিংবা অভিজ্ঞতা গর্ব বা অহং-এর জন্ম দেয় অথবা যদি সত্তার মধ্যে কোনস্থানে একটি গুরুতর ত্রুটির উপস্থিতি থাকে, তখন তারা এই সমস্ত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে মোকাবিলা করতে অসমর্থ হয়, যতদিন পর্যন্ত না অহং-কে অপসারিত কিংবা ভেঙ্গে ফেলা যাচ্ছে অথবা ত্রুটিটিকে শোধরান হচ্ছে। 'ক' আত্ম-ন্যায়পরায়ণতার এক গর্বকে গড়ে তুলেছে যা সম্পূর্ণভাবে তার সাধনার পথে এসে দাঁড়িয়েছে; এছাড়া তার মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ একগুঁয়ে মনের ন্যূনতার উপস্থিতিও রয়েছে যেটি তার নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে এমনভাবে আঠার মত লেগে থাকে যে মনে হয় যেন একমাত্র সেগুলিই সঠিক—তার ব্যবহারের যেসমস্ত দৃষ্টান্ত তুমি তুলে ধরেছ সেগুলি এই ত্রুটিরই চিত্র। এই কারণের জন্যই এখানে সে সকলের সঙ্গে কলহ করে, আর তা এই মনে করে যে সেই হল সঠিক এবং তারা সবাই খুবই মন্দ ও ক্ষতিকারক, সে তার নিজস্ব ত্রুটি ও ভ্রান্তিগুলিকে দেখবার ক্ষেত্রে অসমর্থ এবং যখন শ্রীমা ও আমার কাছ থেকে সে কোনরকম মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না তখন সে আহত এবং ক্ষুণ্ণ বোধ করে কেননা যারা তাকে পীড়া দেয় সেই মন্দ লোকেদের বিরুদ্ধে তার সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে আমরা সমর্থন করি না। সে একজন দক্ষ ও কুশলী কর্মী বটে, কিন্তু সে যতদিন পর্যন্ত এই কঠিনতা ও অহং-কে বজায় রেখে যাবে ততদিন অবধি সে সাধনার ক্ষেত্রে কোনরকম উন্নতিসাধন করতে পারবে না।

*

তোমার মাঝে সামর্থ্য এবং যৌগিক উপাদান রয়েছে, কিন্তু সেসবের সঙ্গে রয়েছে এক খুবই শক্তিশালী নিজের সম্পর্কিত ভাল ধারণা এবং সেইসঙ্গে এক আত্ম-ন্যায়পরায়ণতার বৃত্তি যা সম্পূর্ণতা লাভ করবার পথটিকে রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে এবং সেইসঙ্গে একটি খুবই গুরুতর প্রতিবন্ধককে গড়ে তুলেছে। যতদিন পর্যন্ত একজন সাধকের মধ্যে সেটি অবস্থান করবে, ততদিন পর্যন্ত তার মাঝে প্রকাশ হওয়ার জন্য পরমসত্যের যে প্রচেষ্টা তা সর্বদা নিষ্ফল হয়ে উঠবে, আর সেটি হবে পরমসত্যের

প্রচেষ্টাকে তার মানসিক ও প্রাণময় বিন্যাসে পরিবর্তিত করে তুলবার ফলে, যা এই প্রচেষ্টাকে বিকৃত করে তুলবে, তাকে অকার্যকরী অর্ধসত্যে অথবা এমনকি স্বয়ং সত্যকে এক ভ্রান্তির উৎসে পরিবর্তিত করবে।

*

হ্যাঁ—আত্ম-সমর্থন ভ্রান্ত গতিবৃত্তিসমূহকে সচল অবস্থায় রেখে দেয় কেননা সেটি থেকে তারা এক ধরনের মানসিক-অবলম্বনকে লাভ করে। আত্ম-সমর্থন সর্বদাই অহং ও অজ্ঞানতার এক চিহ্ন। যখন একজনের মাঝে এক প্রসারিত চেতনার উপস্থিতি থাকে, তখন সে জানে যে প্রত্যেকের মধ্যেই সবকিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করবার এক নিজস্ব পথ রয়েছে এবং সে এই পথের সাহায্যে তার নিজস্ব আত্মপক্ষ সমর্থনকে খুঁজে বার করে, যাতে একটি কলহের মধ্যস্থিত উভয়পক্ষই নিজেদের সঠিক বলে বিশ্বাস করতে পারে। একমাত্র একজন যখন ঊর্ধ্ব হতে এক অহংমুক্ত চেতনার মাধ্যমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তখন সে বিষয়টির চতুর্দিককে এবং সেইসঙ্গে তাদের যথার্থ সত্যকেও দেখতে সক্ষম হয়।

*

কিন্তু সেটি হল [অর্থাৎ একজনের ত্রুটিগুলিকে স্বীকার না করা] একটি খুবই সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা, যদিও একজন সাধকের মাঝে সেগুলির অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়, যার উন্নতি বিশালভাবে নির্ভর করে তার মধ্যস্থিত যে বস্তুটিকে পরিবর্তিত করতে হবে তাকে চিনতে পারবার উপর। বিষয়টি এমন নয় যে শুধুমাত্র চিনতে পারাটি নিজেই যথেষ্ট, কিন্তু সেটি একটি অপরিহার্য অংশ। স্বভাবতঃই এক ধরনের গর্ব অথবা আত্মগরিমা যা একে শক্তি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করে। তারা যে শুধুমাত্র অন্য কারোর সম্মুখে নিজের ত্রুটিকে চিনতে পারবে না তাই নয়, এ ব্যতীত তারা নিজেদের কাছেই নিজ ত্রুটিকে গোপন করে রাখবে অথবা এমনকি যদি এক চোখ দিয়ে ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হয়, তখন অন্য চোখটির সাহায্যে অন্যদিকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেবে। নতুবা তারা শব্দ, ছল এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি ছদ্মবেশকে রচনা করে, সেটি প্রকৃতপক্ষে যা তার পরিবর্তে তাকে অন্য কিছু করে তুলতে সচেষ্ট হয়। 'ক'-এর বক্তব্য[১] হল তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য—যোগের পথে যেটি তার প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

*

এটি কেবলমাত্র প্রকৃতির এই অভ্যাস—যা হল অসম্পূর্ণতার বোধের দরুন নিজেকে উদ্বেগপূর্ণ করা এবং অন্যমনস্ক থাকা যা তোমাকে অচঞ্চল হতে বাধা সৃষ্টি করে। যদি তুমি সেগুলিকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাহলে অচঞ্চল হওয়াটি সহজ হয়ে উঠবে।

[১] "আমাকে যদি আমার ত্রুটিকে স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে আমি মৃত্যুকে বরণ করে নেব।"

বিনম্রতা প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-অবমূল্যায়ন কোন সহায়তা করতে পারে না; অতিরিক্ত নিজের সম্পর্কিত ভাল ধারণা ও আত্ম-অবমূল্যায়ন দুটিই ভ্রান্ত মনোভঙ্গী।যে কোন ত্রুটিকে অতিরঞ্জিত না করে চিহ্নিত করা কার্যকরী বটে, তবে একবার চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পর সর্বদা সেগুলির মাঝেই অবস্থান করাটি ভাল নয়; তোমার মাঝে অবশ্যই সেই আত্মবিশ্বাসের উপস্থিতি থাকবে যে ভগবৎকৃপা সবকিছুকেই পরিবর্তিত করতে পারেন এবং তুমি অবশ্যই সেই শক্তিকে তার কর্ম করতে দেবে।

*

এটি [প্রাণময় সংবেদনশীলতা] ভাল বা খারাপ কোনটাই নয়। বিকাশলাভের ধারায় তা ঐভাবে এসে থাকে। অনেকে সচেতনভাবে বা দৃষ্টিগোচররূপে অন্যদের দিকে উন্মুক্ত হতে অসমর্থ হয়ে থাকে, কেননা তারা সংবেদনশীল নয়। আবার অন্যদিকে খুব বেশী উন্মুক্ত হওয়াটিও সমস্যাজনক। (ক্রমশ)

উৎস: ***Letters on Yoga*** **(Imp. 1988), Part Four, PP. 1390-92,**
অনুবাদ : দেবযানী সেনগুপ্ত

আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২২-এর পর)

বিষয়টি সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তা সম্পূর্ণ সঠিক। সাধনার তিনটি স্তর রয়েছে, চৈত্যিক পরিবর্তন, চেতনার উচ্চতর ভূমিসকলের অভিমুখে উত্তরণ—আর সেইসঙ্গে রয়েছে তাদের সচেতন শক্তিসমূহের অবতরণ—অর্থাৎ অতিমানস শক্তি। এমনকি সর্বশেষেও মৃত্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ আনাটি প্রারম্ভিক পর্যায়ভুক্ত হবে না বরং তা হবে অন্তিম পর্যায়ের অন্তর্গত। এই সমস্ত পর্যায়গুলির প্রত্যেকটি সময়ের এক বিশাল বিস্তৃতি এবং এক কঠিন ও সুদীর্ঘ প্রচেষ্টাকে দাবী করে থাকে।

*

যেখানে অন্যান্য বিভিন্ন কিছু যেগুলি সম্পাদন করা এতটাই সহজতর সেগুলিকেই সম্পন্ন করা হয়নি সেখানে দেহকে রূপান্তরিত করবার কথা চিন্তা করাটাই সম্পূর্ণরূপে অমূলক ভাবনা—যদিও নিঃসন্দেহে কোনটিই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সবার প্রথমে আন্তরসত্তাকে অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে যাতে সর্বাপেক্ষা বহিঃস্থ সত্তা তাকে অনুসরণ করতে পারে। কাজেই সেই ধরনের একাগ্রতাসাধনের কিই-বা প্রয়োজন

থাকতে পারে—যদি না একজন ভাবে যে অন্য সবকিছুও নিখুঁত অবস্থায় থাকবে, যেটি কিছুটা বিস্ময়কর দাবী হতে পারে। সর্বপ্রথমে দেহ সম্বন্ধে যা করতে হবে তা হল তাকে ভগবৎশক্তির অভিমুখে উন্মুক্ত করে তুলতে হবে, যাতে সে রোগব্যাধি এবং অবসন্নতার বিরুদ্ধে শক্তিকে সংগ্রহ করতে পারে—যখন সেসব আসবে তখন দেহের মাঝে অবশ্যই সেসমস্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানানোর ও তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য এবং সেইসঙ্গে দেহের মাঝে এক নিরবচ্ছিন্ন বলের প্রবাহকে বজায় রাখবার জন্য শক্তির উপস্থিতি থাকবে। যদি সেটি সম্পন্ন হয়ে ওঠে, তখন দৈহিক পরিবর্তনের অবশিষ্ট অংশটুকু তার যথার্থ সময়টির আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে পারে।

*

এটি সম্পূর্ণরূপে যথার্থ যে সমর্পণ এবং এর অনুবর্তী সমগ্র সত্তার রূপান্তরসাধন হল এই যোগের লক্ষ্য—এক্ষেত্রে দেহকে বর্জন করা হয়নি, কিন্তু একইসঙ্গে প্রচেষ্টার এই অংশটি হল সর্বাপেক্ষা দুরুহ এবং অস্পষ্ট—তুলনামূলকভাবে অবশিষ্ট অংশটি যদিও সহজসাধ্য নয় তবু তা নিষ্পন্ন করবার পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম কঠিন। একজন অবশ্যই দেহের উপর চেতনার এক আন্তর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শুরু করবে, অর্থাৎ এমন এক শক্তির সাথে যা দেহকে সেই সঙ্কল্পকে অথবা সেই বলকে যেটি তার মাঝে সঞ্চারিত করা হয়েছে সেটিকে ক্রমে অধিকতররূপে মান্য করে চলতে শেখাবে। পরিশেষে যখন উচ্চতর থেকে আরও বেশী উচ্চতর এক পরমাশক্তির অবতরণ ঘটবে এবং সেইসঙ্গে দেহের নমনীয়তাও বৃদ্ধি পাবে, তখন রূপান্তর সম্ভবপর হয়ে উঠবে। (ক্রমশ)

উৎস : ***Letters on Yoga*** **(Imp. 1988), Part Four, PP. 1233-34,**
অনুবাদ : মনোজ ভট্টাচার্য

জীবনে অভিজ্ঞতা পেতে চাইলে
তোমাকে স্পর্শ করতে হবে
সেই এক অদ্বিতীয়কে,
সমগ্র সৃষ্টির যা পরম সার সত্য...
সেই হচ্ছে সৃষ্টিমূল, সেইতো উৎস
আর যা কিছু রয়েছে তার বাস্তবতা,
চকিতে তুমি তখন পৌঁছাও গিয়ে ঐক্যের রাজ্যে...

উৎস : (*আশ্রম ডায়েরী, ১৯৮১ অবলম্বনে*) অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

এই বিশ্বের প্রহেলিকা

শ্রীঅরবিন্দ

ইহা অস্বীকার করা যায় না, কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতিই অস্বীকার করিবে না, যে এই জগৎ একটা আদর্শস্বরূপ স্থান নয়, ইহা মানুষকে তুষ্টি দিতে পারে না, ইহার উপর অপূর্ণতা অশিব ও দুঃখভোগের একটা গভীর ছাপ পড়িয়াছে। বস্তুত একদিক দিয়া এই বোধই আধ্যাত্মিক প্রেরণার আরম্ভ—তবে অল্পসংখ্যক কয়েকজন আছে যাহাদের অন্তরে মহত্তর অনুভূতি আপন হইতেই আসে, প্রকট ভুবনের সমস্তটার উপরে যে অন্ধকার ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহার প্রবল দুর্ধর্ষ দুঃখকর বৈরাগ্যকর বোধের দ্বারা বাধ্য না হইয়াই আসে। তথাপি এ প্রশ্ন রহিয়াই যায় যে সত্যই কি (লোকে যেমন বলে) এই হইল বিশ্বভুবনের মূল স্বরূপ; অন্তত যতদিন একটা জড়বিশ্ব আছে ততদিন তাহা এইরূপ হইতেই হইবে, অতএব জন্মপরিগ্রহের কামনা, প্রকট হইবার ইচ্ছা ও সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষাকে আদিম পাপ বলিয়া দেখিতেই হইবে এবং জন্ম ও প্রপঞ্চ হইতে বাহির হইয়া যাওয়াকেই লইতে হইবে মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া। যাহারা জগৎকে এই দৃষ্টিতে বা এইপ্রকার কোন দৃষ্টিতে দেখে (এইরূপ লোকেরই সংখ্যা চিরকাল বেশী) তাহাদের বাহির হইয়া যাইবার নানা সুপরিচিত উপায় আছে, আধ্যাত্মিক মুক্তির সরাসরি সব পথ আছে। কিন্তু বস্তুত ব্যাপার এবংবিধ নাও হইতে পারে, হয়তো আমাদের অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানের কাছে এইপ্রকার বোধ হয় মাত্র,—অপূর্ণতা, অশিব, শোকতাপ, এসব কেবল প্রতিকূল পরিবেশ, চলতি পথের সাময়িক দুঃখ হইতে পারে—বিশ্বভুবনের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার বা সংসারে জন্মপরিগ্রহের সারবস্তু নাও হইতে পারে। যদি না হয় তাহা হইলে পলায়ন-বৃত্তিই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের পরিচায়ক হইবে না, ইহজগতে বিজয়লাভের প্রয়াসই হইবে বুদ্ধিমানের কাজ—বিশ্বের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন পরম সঙ্কল্পের সহিত একযোগে প্রয়াস, নিখুঁত পূর্ণতার একটা আধ্যাত্মিক প্রবেশ-তোরণের সন্ধান করিবার প্রয়াস, যে-তোরণ হইবে দিব্য জ্যোতি, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের পূর্ণ অবতরণের পথ।

সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতিই আমাদিগকে বলে যে একটা নিত্য শাশ্বত তত্ত্ব আছে আমাদের আবাস-ভূমি এই প্রকট বিশ্বের অনিত্যতার পরপারে, এই সসীম চেতনার ঊর্ধ্বে, যাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমরা অনেক হাঁকুপাকু করিয়া অনিশ্চিত পদে চলাফেরা করি। সেই নিত্যবস্তু স্বতঃ-অসীম, মুক্ত, স্বয়ম্ভু,—নিরপেক্ষ জ্যোতি ও নিরপেক্ষ আনন্দ-স্বরূপ। এই যে দুই জীবন ইহলোকের অনিত্য জীবন এবং পরপারের শাশ্বত জীবন—ইহাদের মাঝখানে কি একটা একেবারে অলঙ্ঘ্য গহ্বর আছে, না ইহারা চিরদিনই জীবনের দুই বিপরীত প্রান্ত এবং মানুষ কালের সসীম গণ্ডির মাঝে

পরিভ্রমণ ছাড়িয়া দিলে পরে তখন সে এক লাফে মধ্যবর্তী গহ্বর পার হইয়া অসীম অনন্তে পৌঁছিতে পারে? এইটিই, মনে হয় যেন, এক শ্রেণীর অনুভূতির শেষ প্রান্ত, যাহাকে বৌদ্ধদর্শন চরম সিদ্ধান্ত অবধি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিয়াছে; এক প্রকারের অদ্বৈতবাদও এই পথ ধরিয়াছে বটে, তবে বৌদ্ধদের মতো অতটা অটল দৃঢ়ভাবে নয়, কেন না তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের সম্বন্ধ অংশত স্বীকৃত হইয়াছে,—তবে স্বীকৃত হইলেও শেষ পর্যন্ত দুই তত্ত্বের মধ্যে সত্য-ধ্রুব ও অসত্য-অলীক বলিয়া প্রভেদ রাখা হইয়াছে। কিন্তু অপর এক প্রকারের নিঃসংশয় অনুভূতিও আছে যে জগতে সব কিছুর মধ্যে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে ও সবকিছুর পশ্চাতে ভগবান রহিয়াছেন, এবং আমরা বাহ্যরূপ হইতে আন্তর সত্যে প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারি যে প্রকট বস্তুরাজি সবই সেই এক পরম তত্ত্বের সহিত অভিন্ন এবং তাহারই মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটা অত্যুজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ সত্য যে, যেজন ব্রহ্মকে জানিয়াছে সে জগতে বিচরণ করিতে করিতে, কর্ম করিতে করিতে, জগতের সকল সংঘাত সহ্য করিতে করিতেও ভগবানের পরম শান্তি জ্যোতি ও আনন্দের মাঝে বাস করিতে পারে। তাহা হইলে এখানে তীব্র বিরোধ ছাড়াও আর একটা কিছু আছে,—একটা রহস্য, একটা সমস্যা—যাহার সমাধান, একেবারে মরিয়া না হইয়াও করিতে পারা যায়। এই যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা, ইহা নিজেকে অতিক্রম করিয়া যায়, এবং আমাদের এই পতিত জীবনের অন্ধকারের মাঝে একটা আশার কিরণ লইয়া আসে।

একটা প্রশ্ন এখানে সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হয়—এই জগৎ কি তবে সর্বদা একই ঘটনাবলীর নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা, না ইহার মধ্যে একটা ক্রমপরিণতির প্রেরণা আছে, ইহা বস্তুত ক্রমবিকাশের একটা ধারা, ঊর্ধ্ব গমনের একটা সোপান—মূল প্রতীয়মান নিশ্চেতনা হইতে ধাপে ধাপে ক্রমশ অধিক পরিণত চেতনাতে উত্থান, প্রত্যেক ধাপ হইতে আরও উচ্চে আরোহণ যতক্ষণ না প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই উচ্চতম শৃঙ্গরাজি যাহা আজিও সাধারণ শক্তির অগম্য। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে সেই ক্রমোত্তরণের অর্থ কি, মূল তত্ত্ব কি, তাহার যুক্তিসম্মত পরিণাম কি? মনে হয় যেন সব কিছু নির্দেশ করিতেছে যে জগতে বাস্তবিক একটা অগ্রগতি চলিয়াছে—একটা ক্রমবিকাশ, শুধু ভৌতিক নয়, একটা অতিভৌতিক বিকাশও। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও একটা ধারা আছে যাহা এই ক্রমবিকাশের সহিত সমঞ্জস, যাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে মূলে যে-নিশ্চেতনা আছে তাহা প্রতীয়মান মাত্র, কেন না তাহার মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে এক দিব্য চৈতন্য যাহার পরিণতির সম্ভাবনা অপার, এমন এক চৈতন্য যাহার সীমা নাই, যাহা সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, একটা প্রচ্ছন্ন ও স্বেচ্ছাবরুদ্ধ ভাগবত তত্ত্ব,—জড় পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু যাহার গভীরে লুক্কায়িত রহিয়াছে সর্বপ্রকার পরিণতির সম্ভাবনা। এই প্রতীয়মান নিশ্চেতনার মধ্য হইতে একটার পর একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা

প্রকট হয়, —প্রথমে সংগঠিত হয় জড়দ্রব্য, তাহার অন্তরে বিরাজিত প্রচ্ছন্ন দিব্যসত্তা—তারপর প্রাণশক্তি উদ্ভিদে জাগ্রত হইয়া প্রাণীতে একটা ক্রমবর্ধমান মনোবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়াছে,—পরিশেষে এই মনোবৃত্তি পরিণত ও ব্যবস্থিত হইয়াছে মানবসত্তাতে। এই ক্রমপরিণতি, এই আধ্যাত্মিক প্রগতি, ইহা কি এখানে এই মানবনামা মনোময় জীবে থামিয়া যাইবে, না ইহার রহস্য শুধু একটা জন্ম-জন্মান্তর পরম্পরা যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও পরিণাম হইল সেই স্তর অবধি অগ্রসর হওয়া যেখানে ইহা নিজের ব্যর্থতা উপলব্ধি করতঃ নিজেকে পরিহার করিতে পারিবে এবং কোন মূল অজাত সৎ বা অসৎ তত্ত্বে ঝাঁপ দিতে পারিবে? একটা সম্ভাবনা অন্তত আছে, যাহা পরবর্তী কোন স্তরে ধ্রুব বাস্তবে পরিণত হয়, যে আমরা যাহাকে মন বলি তদপেক্ষা একটা বড় চেতনা আছে এবং আরও ঊর্ধ্বে উঠিলে আমরা এমন এক স্থান প্রাপ্ত হইতে পারি যেখানে জড়ের নিশ্চেতনা ও মনপ্রাণগত অজ্ঞানের প্রভাব আর আদৌ থাকে না; এমন একটা চেতনা সেখানে প্রকট হইতে পারে যাহা অবরুদ্ধ ভাগবত তত্ত্বকে মুক্ত করিবে আংশিক ও অপূর্ণভাবে নয়, আমূল ও সমগ্রভাবে। এই দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তর, মনে হয় যেন, চেতনার উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির অবতরণের ফল, যে অবতরণ পার্থিব ক্ষেত্রকে ঊর্ধ্বে উঠাইতেছে, একটা নূতন স্তর সৃষ্টি করিতেছে,—কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরগুলি এখনও অবতীর্ণ হয় নাই এবং তাহাদের অবতরণের দ্বারাই পার্থিব জীবনের সমস্যার সমাধান হইবে, এবং শুধু আত্মা নয় স্বয়ং প্রকৃতির বন্ধনমোচন হইবে। ইহাই হইল সেই পরম সত্য যাহা প্রথমে ক্ষণিক চমকরূপে দৃষ্ট হইলেও ক্রমশ অধিক পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয়, সেই সূক্ষ্মদর্শীদের দ্বারা যাহাদিগকে তন্ত্র বলিয়াছে বীর সাধক ও দিব্যসাধক,—সেই সত্য যাহা পূর্ণ অভিব্যক্তি ও পূর্ণ অনুভূতির জন্য প্রায় প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে। তাহা হইলে জগতে দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অন্ধকারের বোঝা যতই ভারী হউক না কেন যদি তাহার শ্রেষ্ঠ পরিণতিস্বরূপ এই সত্য আমাদের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে, যে শক্তিমান ও সাহসী পুরুষ, সে কোন দুঃখকষ্ট ভোগকেই এই চরম গৌরবের অত্যধিক মূল্য মনে করিবে না। অন্তত অন্ধকার ছায়া দূর হইয়াছে; একটা দিব্য জ্যোতি পৃথিবীর উপর তাহার আলোকপাত করিয়াছে, আর তাহা কেবল সুদূরের দুর্লভ দীপ্তি নয়।

সত্য বটে, এ সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই যে এই সব ভোগ যাহা আজও রহিয়াছে তাহার আবশ্যকতা কি— এই যে স্থূল ব্যাপারসমূহ লইয়া যাত্রারম্ভ, এই যে সুদীর্ঘ ঝড়তুফানের পথ—এই যে এতদিন ধরিয়া এতটা নির্যাতন, এত অশিব, এত যাতনাভোগ, এসবের কি প্রয়োজন ছিল! মানুষের অজ্ঞানে পতনের যথার্থ কারণ (বা ''কেন'') সম্বন্ধে না হোক, সেই পতনের প্রকার (বা ''কিরূপে'') সম্বন্ধে সকল রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই মোটামুটি এক মত। ভাগ-বিভাগ, ভেদ-বিভেদ, শাশ্বত এক

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া এইসবের ফলেই মানুষের অজ্ঞানে পতন ঘটিয়াছে; মানুষের অহমিকা যে পৃথিবীতে নিজেকে পৃথকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং ভগবানের সহিত, তথা সর্বভূতের সহিত একত্বের উপর জোর না দিয়া নিজের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর জোর দিতে লাগিল—তারপর সেই অহমিকা যে এক অদ্বিতীয় পরম দিব্য শক্তি, জ্ঞান, জ্যোতিকে সমস্ত খণ্ড খণ্ড শক্তির সঙ্গতি নির্ধারিত করিতে না দিয়া প্রত্যেকটি কল্পনা, প্রত্যেকটি শক্তি ও প্রত্যেকটি বস্তুরূপকে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে (পরিশেষে অপরের সহিত সংঘর্ষের দ্বারা) অসীম অপার সম্ভাবনীয়তার মাঝে স্বতন্ত্রভাবে পরিণত হইতে দিতে লাগিল তাহারই ফলে আমরা অজ্ঞানে পতিত হইলাম। এই জগতের দুঃখভোগ ও অজ্ঞানের যথার্থ কারণ হইল একটা স্বতন্ত্র সত্তার ভেদবিভেদ, অহঙ্কার, অপূর্ণ চেতনা, অন্ধকারে হাতড়ান ও ঝুটোপুটি। একবার যেই চেতনারাজি এক অখণ্ড চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, অমনই বাধ্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানে পড়িল, আর এই অজ্ঞানের চরম পরিণাম হইল নিশ্চেতনা; একটা বিশাল অন্ধকার নিশ্চেতনার মধ্য হইতে উঠে এই জড়জগৎ এবং তাহার মধ্য হইতে উঠে একটা আত্মা, যাহা প্রচ্ছন্ন পরম জ্যোতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমবিকাশের ধারাতে চেতনার মধ্যে উঠিবার প্রয়াস করিতেছে,—উঠিতেছে (কিন্তু এখনও অন্ধভাবে) সেই হারান ভাগবত তত্ত্বের দিকে যাহা হইতে সে আসিয়াছিল।

কিন্তু এরকম হইলই-বা কেন? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ও তাহার উত্তর দিবার একটা সাধারণ ধারা আছে যাহা আরম্ভেই বর্জন করিতে হইবে—মানুষী ধারা, তাহার সুনীতি-প্রণোদিত প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রোহ, তাহার ভাব-আবেগোত্থিত চীৎকার। কেন না এমন তো নয় (যেরূপ অনেক ধর্মমত ধরিয়া লইয়াছে) যে একজন বিশ্বাতীত, স্বেচ্ছাচারী, ব্যক্তিগত দেবতা, যিনি স্বয়ং এই অজ্ঞানে পতনের একেবারে বাহিরে অধিষ্ঠিত, তিনি আপন খেয়ালবশে সৃষ্ট জীবনসমূহের উপর অশিব ও দুঃখকষ্ট চাপাইয়াছেন। আমরা যে ভগবানকে জানি, তিনি এক অপার অসীম সত্তা যাহার অনন্ত অভিব্যক্তিতে এই সমস্ত বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে—ভগবান স্বয়ং এখানে রহিয়াছেন, আমাদের পশ্চাতে, তাঁহার অখণ্ড এক সত্তা সারা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; আমাদের অন্তর্যামী ভগবানই পতনের বোঝা ও তাহার অন্ধকার পরিণামসমূহকে বহন করিতেছেন। যদি এরূপ হয় যে সেই ভগবান চিরদিন ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাঁহার পরিপূর্ণ শান্তি, জ্যোতি ও আনন্দ লইয়া, তাহা হইলে তিনি এখানেও আছেন; তাঁহার শান্তি, জ্যোতি ও আনন্দ নিগূঢ়ভাবে সবকিছুকে ধরিয়া রহিয়াছে; আমাদের মধ্যেই আছেন এক আত্মাপুরুষ, এক মূলতত্ত্ব, যিনি তাঁহার বাহিরে প্রকট সত্তাসমূহ হইতে অনেক বড়, যিনি, স্বয়ং পরমাত্মার মতোই, আপন প্রতীকসমূহের নিয়তির প্রভাবের বহির্ভূত। আমাদের অন্তরস্থ এই ভগবানকে যদি আমরা খুঁজিয়া পাই, যদি

আমরা নিজদিগকে এই তত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারি, (যে-তত্ত্ব সত্তাতে ও সারবস্তুতে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন), তাহা হইলে সেই হইল আমাদের মুক্তির তোরণ, এবং তাহার মধ্যে আমরা আমাদের যথার্থ মুক্ত, দীপ্ত ও আনন্দময় স্বরূপে বাস করিতে পারি বিশ্বের বিরোধ-অসঙ্গতি সত্ত্বেও। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক অনুভূতির চিরন্তন সাক্ষ্য। কিন্তু তথাপি বিরোধ-অসঙ্গতির উদ্দেশ্য কি, আদি কারণ কি,—কেন আসিল এই অহমিকা, এই ভাগ-বিভাগ, এই কষ্টকর ক্রমপরিণতির জগৎ? ভাগবত আনন্দ, শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে দুঃখতাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করিবে কেন? মানুষী বুদ্ধিকে তাহার আপন স্তরে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কেন না এই ব্যাপারের আরম্ভ যে-চেতনার অন্তর্গত, যে-চেতনার কাছে ইহা বুদ্ধির অতীত জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ, তাহা বিশ্বগত চেতনা, ব্যক্তিগত মানবের চেতনা নয়, মানুষী যুক্তিবুদ্ধি ও মানুষী অনুভব অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রচয়ে ইহা দেখে, ইহার দৃষ্টি ও বোধ মানবের দৃষ্টি ও বোধ হইতে বিভিন্ন, ইহার চেতনাধারাই অন্যরূপ। মানবমনের কাছে এই জবাব দেওয়া যাইতে পারে যে অনন্ত ভগবান এই সমস্ত বিক্ষোভের বশবর্তী না হইতে পারেন, কিন্তু একবার যখন তাঁহার অভিব্যক্তি আরম্ভ হইল তখন অন্তহীন সম্ভাবনারাজিও আরম্ভ হইল, এবং যে-সমস্ত সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তোলা বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তির কাজ, তাহার মধ্যে দিব্য শক্তি-জ্যোতি-শান্তি-আনন্দের অস্বীকৃতি—প্রতীয়মান ও কার্যত অস্বীকৃতি তাহার সকল পরিণামসহ—স্পষ্টত অন্যতম। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সম্ভবপর হইলে পরেও ইহা গৃহীত হইল কেন, তাহা হইলে মানুষী বুদ্ধি সার্বভৌম সত্যের নিকটতম যে-উত্তর দিতে পারে তাহা হইল এই যে একত্ব-গত ভগবানের অনেকাধারগত ভগবানে পরিণতির পথে বা তাঁহার এই একানেক দুই ভাবের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে একটা স্তরে এই ভয়াবহ সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ একবার আবির্ভূত হইলে ইহা ক্রমবিকাশের ধারাতে অবতীর্যমান আত্মাকে আনিয়া দেয় একটা প্রবল আকর্ষণ যাহা ক্রমশ অপরিহার্য হইয়া উঠে, যে আকর্ষণকে পার্থিব মানুষের ভাষাতে বর্ণনা করা যায় অজ্ঞাতের আহ্বান, বাধাবিপত্তি ও দুঃসাহসিক কর্মের সম্মুখীন হওয়ার আনন্দ, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার ইচ্ছা, অজানা কর্মে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প, আপন সত্তা ও জীবনকে উপাদানস্বরূপ লইয়া অভূতপূর্ব নবীন বস্তু সৃষ্টি করিবার আগ্রহ, বিরুদ্ধতত্ত্বরাজির সামঞ্জস্যবিধানের প্রলোভন—এইসব বস্তুকে মন অপেক্ষা একটা উচ্চতর বৃহত্তর চেতনাতে কার্যকরী করিবার লালসাই হইল পতনের কারণ। কেননা, অবতরণোন্মুখ মূল জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে একমাত্র অজানা বস্তু ছিল গহ্বরের গভীরতা, অজ্ঞানে ও নিশ্চেতনাতে প্রবিষ্ট ভগবানের অবতরণের সীমা। অপরপক্ষে ছিল ভাগবত ঐক্যের দিক হইতে একটা বিরাট স্বীকৃতি, তাঁহার করুণা ইচ্ছা ও মৈত্রী প্রসূত, একটা পরম উপলব্ধি যে এই বস্তু অবশ্যম্ভাবী—আর যখন ইহা ঘটিয়াছে

তখন ইহাকে চরম পরিণতি অবধি লইয়া যাইতেই হইবে,—একদিক দিয়া দেখিলে ইহার আবির্ভাব এক অবাধ অনন্ত জ্ঞানেরই অঙ্গীভূত,—আর, যখন রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তখন একটা নবীন অভূতপূর্ব সূর্যোদয়ে নিষ্ক্রমণও নিশ্চিত, —আর, শুধু এই পথেই পরম সত্যের একটা বিশিষ্টপ্রকার অভিব্যক্তি সম্ভবপর, —সেই সত্যের প্রতীয়মান বিরুদ্ধতত্ত্বচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমপরিণতির বিধানে দিব্য নবরূপে অভ্যুদয়। এই স্বীকৃতিরই অঙ্গীভূত ছিল পরম উৎসর্গের সঙ্কল্প,—অজ্ঞান ও তাহার পরিণামরাজির ভার বহন করিবার জন্য নিশ্চেতনার মাঝে ভগবানের অবতরণ, ক্রুশের ও বিজয়কেতনের মধ্য দিয়া সার্থকতা ও যুক্তির দিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অবতার ও বিভূতিগণের আবির্ভাব। অনির্বচনীয় সত্যের বর্ণনে বড় বেশী রকম প্রতীকের সাহায্য লওয়া হইল! কিন্তু প্রতীকের সাহায্য ব্যতিরেকে বুদ্ধির অতীত রহস্যকে বুদ্ধির সম্মুখে আনা যায় কিরূপে? ব্যক্তি যখন তাহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং ভাগীদার হইয়াছে বিশ্বগত অভিজ্ঞতার এবং সেই জ্ঞানের যাহা অভেদবোধের মধ্য দিয়া সবকিছুকে দেখে, কেবল তখনই প্রতীকের—পার্থিব ঘটনার সহিত সম্বন্ধ প্রতীকের—পশ্চাতে অবস্থিত পরম সত্যরাজি আপন দিব্য রূপ ধারণ করে এবং প্রতীয়মান হয় সহজ, স্বাভাবিক এবং বস্তুর সারসত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন মূর্তিতে। একমাত্র সেই বৃহত্তর চেতনার ভিতরে প্রবেশের দ্বারাই মানুষ ধারণা করিতে পারে যে ঐ চেতনার আত্মসৃষ্টি ও আত্মসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়তি-নির্দিষ্ট।

বস্তুত ইহা হইল শুধু অভিব্যক্তির সেইটুকু সত্য যেটুকু আমাদের চেতনাতে আসিয়া দাঁড়ায় যখন তাহা শাশ্বত অনন্ত এবং কালের কাঠামোর মধ্যবর্তী সীমার উপর অবস্থিত, যেখানে ক্রমবিকাশের ভিতরে এক ও বহুর সম্বন্ধ আত্মনির্ধারিত, এমন একটা স্তর যেখানে ভবিষ্য বস্তুচয় প্রচ্ছন্ন, এখনও প্রকাশ্যে ক্রিয়মাণ নয়। কিন্তু বিমুক্ত-চেতনা আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে পারে যেখানে আর সমস্যা থাকে না, সেখান হইতে উহাকে দেখিতে পারে একটা পরম অভেদবোধের আলোকে, সেখানে বস্তুরাজির স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ম্ভু সত্যে সবকিছু পূর্বনির্ধারিত এবং আপনা-আপনি নিরপেক্ষ চৈতন্য, জ্ঞান ও আনন্দের কাছে প্রমাণীকৃত, যে-আনন্দ সমস্ত সৃষ্টি ও অসৃষ্টির পশ্চাতে অবস্থিত; ইতি ও নেতি উভয়ই দৃষ্ট হয় অনির্বচনীয় সত্যের দৃষ্টিতে, যে-সত্য তাহাদিগকে বিমুক্ত করে, তাহাদের বিরোধ ভঞ্জন করে। কিন্তু সে-জ্ঞানকে মানবমনের বোধগম্য করা যায় না, তাহার জ্যোতির্ময় অক্ষরাবলী বড় একটা পড়া যায় না, তাহার দীপ্তি বড় বেশী উজ্জ্বল আমাদের চেতনার পক্ষে কেননা আমাদের চেতনা বিশ্বপ্রহেলিকার জটিলতা ও আঁধার আলোকে এতটা অভ্যস্ত, তাহাতে এতটা জড়িত যে তাহার রহস্য ধরিতে পারে না, তাহার সূত্রকে অনুসরণ করিতে পারে না। সে যাই হোক, যখন আমরা আমাদের সূক্ষ্ম সত্তাতে অন্ধকার ও দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠি, কেবল তখনই

আমরা ইহার পূর্ণ মর্ম বুঝিতে পারি, কেবল তখনই আমাদের আত্মা ছাড়ান পায় ইহার গোলকধাঁধার মধ্য হইতে। মুক্তির সেই উচ্চস্তরে উত্থানই হইল যথার্থ নিষ্ক্রমণের পন্থা, ধ্রুব জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

কিন্তু সেই মুক্তি এবং সেই অতিক্রমণের ফলে যে বিলোপ বা অভিব্যক্তির মধ্য হইতে পূর্ণ তিরোধান আসিবেই, এরূপ নয়; ইহার পরিণাম হইতে পারে কর্মে মুক্তির জন্য প্রস্তুতি—উচ্চতম জ্ঞান ও সুতীব্র শক্তির এমন কর্ম, যাহা বিশ্বকে দিব্যরূপ দিতে পারিবে ও ক্রমবিকাশের প্রেরণাকে সার্থক করিতে পারিবে। ইহা একটা এরূপ উচ্চ ভূমিতে উত্থান, যেখান হইতে আর পতনের সম্ভাবনা নাই, যেখানে আপন শক্তিতে পক্ষ মেলিয়া নামিয়া আসিবে উপরের জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দ।

সৎ-এর সামর্থ্যের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই ভুবনে অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু অভিব্যক্তির স্বরূপ, স্বভাব, নিজস্ব সামর্থ্য, তাহার উপাদানসমূহের বিন্যাস, সব নির্ভর করে সেই চেতনার উপর যাহা সৃজনীশক্তির ভিতরে কাজ করে, নির্ভর করে সেই চেতনাশক্তির উপর যাহা সৎ নিজের মধ্য হইতে উন্মুক্ত করে ভুবনে অভিব্যক্তির জন্য। সৎ-এর স্বভাবই এই যে তাহা আপন চেতনাশক্তিরাজির শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদ করিতে পারে, এবং সেই বিভাগ ও ভেদ অনুসারে তাহার জগৎকে নির্ধারিত করিতে পারে কিংবা তাহার আত্মপ্রকাশের পরিমাণ ও সীমা নির্দেশ করিতে পারে। সৃষ্ট বিশ্বভুবন, যে শক্তির আয়ত্তাধীন, তাহারই দ্বারা সীমাবদ্ধ; সেই শক্তি অনুসারেই উহা দেখে ও বাঁচে, যদি বেশী দেখিতে চায়, যদি আরও সমর্থভাবে বাঁচিতে চায় তো তাহা পারে শুধু আরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন বৃহত্তর শক্তির দিকে উন্মুক্ত হইয়া, সেই শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়া বা তাহাকে নামাইয়া আনিয়া। ইহাই আমাদের জগতে চেতনার ক্রমপরিণতিতে ঘটিতেছে, নিশ্চেতন জড়পদার্থের জগৎ এই প্রয়োজনের চাপে জাগাইতেছে একটা জীবনীশক্তি, একটা মানসশক্তি, যাহা সৃষ্টির নব নব রূপ তাহার মধ্যে লইয়া আসিতেছে এবং এখনও প্রযত্ন করিতেছে উদ্ভূত করিতে বা তাহার মাঝে নামাইয়া আনিতে কোন অতিমানস শক্তিকে। উপরন্তু ইহা সৃজনীশক্তির একটা গতিবৃত্তি যাহা চেতনার দুই প্রান্তের মধ্যে চলাচল করিতেছে। একপক্ষে, অন্তরে বা ঊর্ধ্বে একটা নিগূঢ় রহস্য আছে যাহার মধ্যে রহিয়াছে সকল সম্ভাবনারাজি—জ্যোতি, শান্তি, শক্তি ও আনন্দ সেখানে চিরদিনই প্রকট, এখানে অবরোধ উন্মোচনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। অপরপক্ষে আর একটা চেতনা আছে, বহির্মুখী, বহিস্তলে বা নিম্নে অবস্থিত, যাহা যাত্রারম্ভ করে প্রতীয়মান বিপরীত তত্ত্বরাজি হইতে—নিশ্চেতনা, জড়তা, অন্ধশক্তির চাপ, দুঃখ, কষ্টের সম্ভাবনা—এবং বাড়িয়া উঠে নিজের মধ্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির আবাহন দ্বারা, যে-শক্তিরাজি তাহাকে তাহার ভুবনকে বৃহত্তর ধারাতে পুনঃসৃষ্টি করায়—এইরূপ প্রত্যেক পুনঃসৃষ্টি বাহির করিয়া আনে আন্তর সামর্থ্যের

কিছু কিছু ভাগ এবং তাহার ফলে ঊর্ধ্বে অপেক্ষমান পূর্ণতার অবতরণ নিত্য বেশী সম্ভবপর হইয়া উঠে। যে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বকে আমরা আমাদের সত্তা বলি, তাহা যতদিন চেতনার অধস্তন শক্তিচয়ে কেন্দ্রীভূত, ততদিন তাহার জীবনের, জীবনের লক্ষ্যের, জীবনের প্রয়োজনের প্রহেলিকা একটা অভেদ্য রহস্যই থাকিবে; এমনকি যদি সত্যের একটুখানি অংশ বাহ্য মনোময় মানুষের কাছে পৌঁছায় তো তাহাও সে পুরোপুরি ধরিতে পারে না, হয়তো তাহার কদর্থ করে, অপব্যবহার করে, জীবনে তাহাকে অসত্য করিয়া তোলে। তাহার যে ভর দিয়া চলিবার যষ্টি তাহা নির্ধারিত নিঃসংশয় জ্ঞানের জ্যোতি-নির্মিত ততটা নয়, যতটা ভক্তির অগ্নি দিয়া গঠিত। সে তাহার অক্ষমতা ও অজ্ঞনের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে শুধু মনের সীমার ঊর্ধ্বস্থ উচ্চতর চেতনাতে উঠিয়া গিয়া, যাহা এখনও তাহার বোধের অতীত। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া সে যখন একটা নূতন পরাচেতন জীবনের আলোকে প্রবেশ করিবে তখন সে তাহার পূর্ণ মুক্তি ও দীপ্তি লাভ করিবে। নিভৃত সাধক ও আধ্যাত্মিক সন্ধানীদিগের অভীপ্সার উদ্দেশ্য চিরদিনই ছিল এই দিব্য অতিক্রমণ।

কিন্তু শুধু এই ব্যক্তিগত অতিক্রমণ পার্থিব সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন ঘটাইবে না, একটি মুক্ত আত্মার বিশ্ব হইতে পলায়ন সারা বিশ্বের কোন তফাত করিবে না। তবে, এই সীমাতিক্রমণকে শুধু উত্তরণের নয়, অবতরণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকেও যদি ফিরান যায়, তাহা হইলে সীমারেখাও এখন যাহা আছে—একটা ঢাকন বা একটা প্রাচীর—তাহা থাকিবে না, সত্তার চেতনার উচ্চতর শক্তিরাজির প্রবেশ-পথে পরিণত হইবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে, শ্রেষ্ঠতম শক্তিচয়ের অবতরণ ঘটিবে, যাহার ফলে, পার্থিব অবস্থা একেবারে উলটপালট হইয়া যাইবে; কেননা তাহার ফলে এমন একটা সৃষ্টি আসিবে যাহা আধ্যাত্মিক ও অতিমানস জ্যোতির পূর্ণ প্রবাহের মধ্যে উঠিয়া যাইবে; এখনকার মতো জড় নিশ্চেতনার অন্ধকার হইতে মনের অর্ধদীপ্তিতে নিষ্ক্রমণ আর থাকিবে না। শুধু এইরূপ একটা আত্মোপলব্ধির পূর্ণ বন্যার মধ্যেই দেহীমানব বুঝিতে পারে, তাহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন বস্তুরাজির আলোকে, তাহার এই অন্ধকারের ভিতরে অবতরণের মর্ম ও সাময়িক প্রয়োজন এবং তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থাবলী, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে এবং এই ধরাতলেই আনিতে পারে তাহার স্থানে প্রকট ভগবানের অভিব্যক্তির জ্যোতির্ময় সত্তান্তর—আর তাঁহার প্রচ্ছন্ন, বিকৃত বা ছদ্মবেশী স্বরূপের নয়। জুন, ১৯৩৩

উৎস: ***The Riddle Of This World*****, অনুবাদ : চারুচন্দ্র দত্ত**